সেরা

– আনিস

১৯৯৩–এ যায়যায়দিনের ডাকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে এ দেশে ভালোবাসা দিবস হিসেবে প্রচলন, প্রচার এবং প্রসার ঘটে। এই ভালোবাসা নিয়ে বর্তমানে আমাদের ভেতর মাতামাতির শেষ নেই। হাজারও অনুষ্ঠান, পার্টি, গান–বাজনা ইত্যাদি। যায়যায়দিন–এর *ভালোবাসা* সংখ্যায় থাকে প্রেম–ভালোবাসা বিষয়ক অনেক রচনা। কিন্তু আমরা কখনো প্রেম ভালোবাসা বিষয়ক কবিতা, গল্প কিংবা উপন্যাসকে সালের কিংবা শতাব্দীর সেরা নির্বাচিত করি না।

কিছু কিছু সত্যি ঘটনা আমাদের প্রচণ্ড নাড়া দেয়। আমাদের ভাবিয়ে তোলে। তেমনি একটি আমাদের এই উপমহাদেশের মর্মস্পর্শী প্রেমের সত্য ঘটনা আমরা অনেকেই হয়তো জানি না।

নিচের সত্য ঘটনাটি ডমিনিক লাপিয়ের ও ল্যারি কলিন্স–এর বিখ্যাত গ্রন্থ *ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট* (Freedom At Midnight) থেকে নেয়া। আমার মতে এটিই এই উপমহাদেশে বর্তমান যুগের সেরা প্রেম কাহিনী।

পাকিস্তান থেকে ইনডিয়া বা ইনডিয়া থেকে পাকিস্তানে পুনর্বাসন সময়কার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ডামাডোলে থেকে সৃষ্ট এই প্রেমের ঘটনার সময় সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭। শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন–এর ফৌজি বিভাগে চাকরি করতো বুটা সিং। বয়স পঞ্চান্ন। অবসর নিয়েছেন। বিয়েও করেননি। জমিজমা নিয়েই অবসর জীবন কাটতো তার।

একদিন তিনি ক্ষেতে কাজ করছেন। হঠাৎ চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো এক মেয়ে। পেছন পেছন মারমুখো এক শিখ। বুটা সিং দাড়ালেন মাঝখানে। চোখের পলকে বুঝলো ঘটনা। অনেক মেয়েই তখন ধর্ষিতা হতো সব দুর্বৃত্তের হাতে। তারপর বিক্রিও করা হতো পতিতালয়ে। সেই শিখ দুর্বৃত্তের কাছ থেকে পনেরোশ টাকার বিনিময়ে এই মেয়েটিকে মুক্ত করলেন আরেক মহানুভব শিখ, বুটা সিং।

তারপর বদলে গেল তার জীবন। মুক্তি পাওয়া মেয়েটা আশ্রয় পেল তার ঘরে। পঞ্চান্ন বছর বয়সে বুটা সিং অনুভব করলেন প্রেমের মহত্ব। মুক্তির স্বাদে নিজেকে বিলিয়ে দিল যে মেয়েটি বুটা সিংয়ের কাছে তার নাম জয়নাব। বয়স মাত্র সতেরো।

এরপর একদিন শিখ ধর্ম মতে বিয়ে হলো তাদের। বিয়ের এগারো মাস পরে এলো কন্যা সন্তান। আনন্দের বন্যায় যেন ভেসে যেতে লাগলেন বুটা। খুলে বসলেন ধর্ম গ্রন্থ *গ্রন্থসাহেব।* পাতা উল্টে যে শব্দ প্রথম দেখলেন, সেটাই রাখলো তার মেয়ের নাম তনবীর। অথচ ধারণাও করলেন না, ভবিষ্যতে কতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে তাদের জীবনে।

তিন কুলে বুটা–র বেচে ছিল দুই ভাইপো। তারা অনেক দিন পর ফিরে তো অবাক! বুটার সুখ অসহ্য তাদের। বুটা বিয়ে করেছে, সুতরাং জমি–জমা তাদের কপালে জুটবে না। সে সময় জয়নাব–এর মতো যেসব মেয়েরা ধর্ষিতা হতো অথবা অভিবাসনের সময় হারিয়ে যেতো বা ঠিকানা বিহীন তাদের পুনর্বাসনের জন্য ইনডিয়া, পাকিস্তান সরকার এক আইন জারি করে। খোলা হয় আশ্রয় ক্যাম্প। আশ্রয় ক্যাম্প থেকে দেশত্যাগ কিংবা অভিভাবকের কাছে যাওয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রাখা হয়।

দুই ভাইপো জানিয়ে দিল সব। আশ্রয় ক্যাম্প থেকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল জয়নাব–কে।

বুটা কাণ্ডজ্ঞান হারালেন যেন। প্রথমেই এসে আশ্রয় ক্যাম্পে তার বিবিকে ফেরত চাইলেন। বললেন, সে তো আশ্রয়হীনা কোনো মেয়ে নয়।

লাভ হলো না।

ছুটলেন তিনি দিল্লি–তে এবং যা করলেন তা যে কোনো শিখ–এর জন্যই করা নিষিদ্ধ।

চুল–দাড়ি কেটে দিল্লির বড় মসজিদে এসে কলাম পড়ে মুসলমান হলেন। জামিল নাম নিয়ে তিনি ছুটলেন পাকিস্তান দূতাবাসে। তার বিবিকে ফেরত চাইলেন। না। তিনি পেলেন না জয়নাবকে। বরং এক সকালে, জয়নাবের পিতা–মাতা পাকিস্তান থেকে এসে তাদের মেয়েকে আশ্রয় ক্যাম্প থেকে নিয়ে গেলেন।

বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে নিজেও বাচ্চা ছেলের মতো কাদলেন বুটা। যদিও জয়নাব প্রতিজ্ঞা করে গেল, পাকিস্তানে গিয়েও সে প্রতীক্ষা করে থাকবে। বুটা ছাড়া সে কখনোই অন্য কাউকে বিয়ে করবে না।

এরপরের ঘটনা আরো করুণ। মুসলমান হিসেবে বুটা এবার পাকিস্তানে পুনর্বাসিত হতে চাইলেন। পারলেন না।

আরো কিছুদিন পরে ঘুরতে যাবেন বলে পাকিস্তান দূতাবাসে গিয়ে ভিসা চাইলেন।

সেটাও মিললো না।

তখন নিরুপায় হয়ে জীবন বাজি রেখে সেই বুড়ো বুটা সিং তার মেয়েকে নিয়ে সীমান্ত পথ পাড়ি দিয়ে চলে এলেন পাকিস্তানে।

জয়নাবের গ্রামে এসেই প্রথম মানসিক ধাক্কা খেলেন বুটা। কয়েক মাস আগেই জয়নাবের বিয়ে হয়েছে তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে। তিনি যখন পাগলের মতো কাদছেন জয়নাবের বাড়ির সামনে তখন লোকজন তাকে মারধর করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবহাওয়ায় পারলে তখনই মেরে ফেলে বুটাকে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তারা অর্ধমৃত বুটাকে পুলিশ দিল।

বিচার শুরু হলো বুটার। বুটা ফেরত চাইলেন নিজ স্ত্রীকে। বিচারকের কাছে তিনি করুণ মিনতি জানালেন অন্তত একবার যেন তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রথম বুটার আবেদন অগ্রাহ্য হলো না। খবর পেয়ে সারা গ্রাম যেন ভেঙে পড়লো আদালত প্রাঙ্গণে। উত্তেজিত গ্রামবাসীর মনোভাব, তাদের মেয়েকে কেউ ভিনদেশে নিয়ে যেতে পারবে না।

আদালত প্রাঙ্গণে জয়নাব শনাক্ত করলো বুটাকে এই বলে যে, সে আমার প্রথম স্বামী। মেয়েকেও চিনলো। তারপর কাদতে কাদতে বললো বিচারককে, বুটার সঙ্গে সে ইনডিয়ায় ফিরে যেতে চায় না।

যে মেয়েটার জীবনে সে ফিরিয়ে দিয়েছিল আনন্দ, আজ সেই জয়নাবই ফিরিয়ে দিল তাকে। শোকে পাথর বুটা সিং করুণ মিনতি জানালেন, জয়নাব যেন মেয়েটাকে তার কাছে রাখে। তিনি নিজে আর কখনো মা–মেয়ের মুখোমুখি হবেন না।

উত্তেজিত জনতার চোখে চোখ রাখলো জয়নাব। হিংস্রতা তাকে যতোটা ভীত করলো সেই ভয় নিয়ে সে কাদতে কাদতে বললো, মেয়েটাকেও সে নিজের কাছে রাখতে চায় না।

হয়তো মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এমন কথা বলে ফেলতে পারে জয়নাব।

জয়নাবের উত্তর শুনে ঝর ঝর করে কাদলেন বুটা সিং। তারপর মেয়েটাকে কোলে করে বেরিয়ে এলেন আদালত থেকে। পকেটের সব টাকা খরচ করে নতুন পোশাক কিনে দিলেন মেয়েটাকে। ভালো খাওয়া–দাওয়া করলেন। তারপর এসে পৌছালেন লাহোর–এ শাহদারা রেলস্টেশনে। ট্রেন যখন আসছে, তখন মেয়েটি আশ্চর্য শান্তিতে ঘুমোচ্ছে বুটার কোলে। বুটা ট্রেনের সামনে এসে দাড়ালেন।

ট্রেনের ধাক্কায় প্রথমেই হাত থেকে দূরে ছিটকে পড়লো মেয়েটি এবং বেচে গেল। খণ্ড–বিখণ্ড হলো বুটা সিংয়ের দেহ। হই চই পড়লো যাত্রীদের মধ্যে। মেয়েটি কাদছে অঝোর ধারায়। মৃত বুটার পকেটে পাওয়া গেল একটা ছোট্ট চিঠি। জয়নাবকে লেখা।

প্রিয় জয়নাব,
আমি জানি লোকের সামনে তুমি যা বলেছো সেটা তোমার মনের কথা নয়। তুমি সকলের কথা শুনলেও আমার মনে হয়, তুমি অবশ্যই আমাকে ভালোবাসো। আর এ কারণেই আমার শেষ দাবি, অন্তত তোমার গ্রামে আমার কবরটা দিও। আর মাঝে মাঝে এসে আমার কবরে ফুল দিও।

বুটা আত্মহত্যা করেছিলেন ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭-তে। অথচ তার শেষ দাবিও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে পালিত হয়নি। জয়নাবের দ্বিতীয় স্বামী ও স্থানীয় গুণ্ডারা কবর খুড়ে বুটার লাশ গায়েব করে দিতে চেয়েছিল। নতুন করে যেন এই নিয়ে দাঙ্গা না বাধে সে কারণে বুটার কবর দেয়া হয়েছিল লাহোরে জয়নাবের গ্রাম থেকে অনেক অনেক দূরে।

সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর থেকে

সোনার বালা

– জহিরুল ইসলাম

সউদি আরব-এ আসার তিন বছর পরই আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে আমাকে বলা হলো, আমি যেন দেশে যাই। কেননা দেশে গেলে আমাকে বিয়ে করাবে। তখন আমি ভাবতে থাকি, এখন যদি দেশে গিয়ে বিয়ে করি তাহলেও আবার সউদিতে আসতে হবে। তাই আমার আর দেশে যাওয়া হলো না। কেননা বিয়ে করে যদি আবার প্রবাসে থাকি তাহলে বিয়ে করে কি লাভ!

এভাবেই পাচ বছর সউদিতে রয়ে গেলাম। এখন দেশে যাবো ভাবছি। বাজার করাও প্রায় শেষ সবার জন্যই কিছু না কিছু কিনেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার বিয়েতে যা দরকার সব কিছুই আমার বড় ভাইয়া কিনে রেখেছেন। কিন্তু তারই মাঝে আমার কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই সউদি আরবের এক স্বর্ণের দোকানে যাই। দোকানে গিয়ে দুটা বালা আমার খুব পছন্দ হয়ে যায়।

ভাবতে থাকি এই বালা দুইটা তার হাতে অর্থাৎ আমি যাকে বিয়ে করবো তার হাতে খুব ভালো লাগবে। পরে ওজন ও দাম সব কিছু দেখা হলো। উল্লেখ্য যে, বালা দুটির দাম হয়েছে বাংলাদেশের চব্বিশ হাজার চারশ। ওই মুহূর্তে আমার কাছে সম্পূর্ণ টাকা না থাকাতে কিছু টাকা দোকানদারকে দিয়ে বললাম, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো টাকা দিয়ে বালা দুটা নিয়ে যাবো। কারো কাছে যেন বিক্রি না করে সেই কথাও বলে এলাম।

পরে বাসায় এসে ওই দিনই পুরো টাকা নিয়ে আবার দোকানে গিয়ে বালা দুটো নিয়ে এলাম। এখন ভাবছি আমার ভাবী ও ভাইয়া বালা দুটা দেখে মনে কষ্ট পান কি না। তারপরও যদি দেখি ভাবী ও ভাইয়া ঠিকই কষ্ট পাবেন, তাহলে অন্যভাবে হলেও বালা দুটা আমি তাকে পরাবো।

জীবনে কোনো মেয়ের সঙ্গে চলিনি এ কথা বলবো না। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ভালোবাসা রয়ে গেছে তার জন্য যাকে আমি দেখছি আমার স্বপ্নের চোখে। এখন ভাবছি, যাকে আমি এভাবে ভালোবাসতে চাইছি সে আমাকে কতোটুকু ভালোবাসবে?

সউদি আরব থেকে

ভুলিনি

– শিরিন

ভালোবাসার গল্প বলা এখন অনেক সহজ। আজকের দিনে প্রেমিক–প্রেমিকা হিসেবে ছেলেমেয়েরা স্বীকৃতি পায়। তাদের মতামত অনুযায়ী বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমার বুকের ভেতর ভালোবাসার স্মৃতি, অশ্রুজল জমে বরফ হয়ে আছে। আজ লেখা হয়ে সেই বরফ হওয়া অশ্রুজল ঝরে পড়তে চাইছে। যে ভালোবাসাকে কোর্ট ম্যারেজ করার ভয়ে স্বীকৃতি দিতে পারিনি। যে ভালোবাসার মানুষটিকে একটা দিনের জন্যও ভুলতে পারিনি তাকে উদ্দেশ্য করেই এ লেখা।

সে আজ অনেক দূরে। প্রায় দুই যুগ ধরে সাগর পারে প্রবাসী হয়ে আছে। জানি না তার কখনো আমাকে মনে পড়ে কি না। আমাকে মনে না রাখারই কথা। কারণ, পারিবারিক চাপে আমি অন্যত্র বিয়েতে মত দিয়েছিলাম।

আমরা সহপাঠী ছিলাম। এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে অবসর কাটাচ্ছিলাম দুজনা। সেই সময় পরিচয়। প্রথমে বন্ধু। তারপর ভালোলাগা যে কবে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে তা বুঝতেই পারিনি।

এক ৬ এপৃল দুজন দুজনার কাছে ধরা পড়লাম। সেই থেকে ভালোবাসা আরো গভীর হলো। তার সঙ্গে গল্প করে, তার চিঠি পেলে আনন্দে আত্মহারা হতাম।

দৈহিক প্রেম নয়। কিন্তু মনের দিক থেকে আমরা একে অপরের জন্য পাগল ছিলাম। যতোক্ষণ এক সঙ্গে থাকতাম ততোক্ষণই ভালো লাগতো। তরুণ বয়সের সেই সব ঝলমলে স্মৃতি এতো বছরে একটা দিনের জন্যও ভুলিনি। সেই ভালোলাগার দিনগুলো খুব মধুর ছিল।

কিন্তু আমার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না। তাকে লেখা আমার একটা চিঠি তার গুরুজনদের হাতে পড়ে গেল। তারা আমার বাবা মায়ের কাছে নালিশ জানালেন। এতে আমার বাবা–মা খুব অপমানিত বোধ করলেন। সেই থেকে আমার ওপর নেমে এলো নানান রকম বিধি–নিষেধ।

তখনকার দিনে আমরা মেয়েরা একা একা খুব বেশি বাইরে বের হতাম না। তাই কলেজ পালিয়ে দেখা করতাম। চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। এভাবে সবার চোখকে ফাকি দিয়ে যোগাযোগ রাখতাম।

চার বছর খুব কষ্ট করে কাটালাম। কিন্তু আমার বাড়িতে অশান্তি নেমে আসে ভীষণভাবে।

আমরা তিন বোন ছিলাম। দেখতে মোটামুটি ভালোই ছিলাম। আমি বড়। তাই নানান জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো। নানান অজুহাতে সব নাকচ করছিলাম।

আমার আব্বা, আম্মা সবই বুঝতেন।

মা ছিলেন খুব রগচটা প্রকৃতির মানুষ। আমাকে মারধর, গালিগালাজ করতেন প্রতিদিন। চোরের মতো থাকতাম, সব সময় চোখের পানি ফেলতাম, আল্লাহকে ডাকতাম।

আব্বু ঠাণ্ডা মাথার লোক ছিলেন। আমাকে অনেক বোঝাতেন, আমি যেন পরিবারের বদনাম করে কোর্ট ম্যারেজ না করি।

আব্বার মাথায় হাত রেখে শপথ করেছিলাম, কোর্ট ম্যারেজ করবো না। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল ভীষণভাবে। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেল কাদতে কাদতে। দূর থেকে মানুষ দেখলে চিনতে পারতাম না।

আব্বা আমাকে একটা সুযোগ দিলেন। বললেন, ওই ছেলেকে বলো, তাদের বাসা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আনতে।

খুব কষ্ট করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

সে বললো, বাসায় বলতে পারবো না, চলো, নিজেরা কোর্ট ম্যারেজ করি।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। বাসায় এসে প্রচণ্ড জ্বরে বিছানায় পড়লাম। আমার দুর্বল মন, দুর্বল শরীর। কোর্ট ম্যারেজ-এর কথা মনে করলেই ভয় পেতাম। মনে হতো কোর্ট ম্যারেজ করলে আব্বা মারা যাবেন। আমার জন্য ছোট ভাইবোনেরা বিপদে পড়বে। আব্বাকে দেয়া কথা রাখতে গিয়ে আমার জীবনের সব আনন্দ হারালাম।

সেই সময় আত্মহত্যা করিনি ঠিকই কিন্তু আত্মাকে হত্যা করলাম।

গুরুজনদের চাপের মুখে বিয়েতে মত দিলাম। বিয়ের কয়েকদিন আগে তার চিঠিগুলো পড়লাম। পাগল হয়ে বাসা থেকে বের হলাম। কিন্তু যার মাধ্যমে যোগাযোগ করতাম সেই ছেলেটা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল।

তখন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। সেই দিন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে সব কিছু অন্য রকম হতো। বাসায় ফিরে তার কথাও চিন্তায় এলো। সে তখন স্টুডেন্ট। তখন বিয়ে করলেও সে আমাকে কোথায় আশ্রয় দেবে? তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করবো! এসব ভাবলাম। কিন্তু এখন বুঝি এসব ঘটনা এতো চিন্তা-ভাবনা করে হয় না।

তখন বাড়ির মুরুব্বিরা বলেছিলেন আমার ভাগ্যে তার সঙ্গে বিয়ে নেই।

আমার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেল। সে জানতেও পারলো না। তাকে বলেছিলাম, যুদ্ধ শুরু হলে বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। সেই ভেবে ও নিশ্চিত ছিল হয়তো।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। ১৯৭১-এর জুলাইয়ে আমার বিয়ে হলো। বিয়ের পরও জীবনের প্রতিটি দিন তাকে মনে করেছি। তার কুশল কামনা করেছি। কিন্তু যোগাযোগ করার চেষ্টা কখনো করিনি। তবে তার খবর কিছু কিছু জানতাম। সে বিয়ে করেছে এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে সুখেই আছে।

আমার স্বামী একজন হাসি-খুশি, উদার মনের মানুষ ছিলেন। টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি, ভালো ফ্যামিলি সবই পেয়েছিলাম জীবনে। কিন্তু একটা প্রিয় মানুষকে পাইনি। আর তাকে কোনোদিন ভুলতেও পারিনি। অবসরে তার কথা ভাবতাম, তার ভালো চাইতাম।

এই পৃথিবীতে সবার কাছে আমি খুব ভালো মানুষ। বিয়ের পনেরো বছর পর হঠাৎ আমার স্বামী মারা গেলেন। আমার তিনটা ছোট সন্তানকে বুকে আকড়ে জীবন কাটালাম।

তাদেরকে সুন্দরভাবে মানুষ করেছি। তাদের ইচ্ছামতো বিয়ে দিয়েছি। তাদের কাছে আমি একজন ভালো মা। আমার শ্বশুরবাড়িতে আমি একজন ভালো বৌ।

আমার বাবা-মায়ের কাছে আমি একজন ভালো সন্তান।

এই জগতে বর্তমান আমি একজন প্রবীণ মানুষ। তাই এখন সাহস হয় যোগাযোগ করতে। তাই যায়যায়দিনের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যে এই লেখাটা। মাঝে মধ্যে মনে হয় যাকে সারাটা জীবন এতো ভালোবাসলাম তার সঙ্গে একবার দেখা হলে খুব ভালো হতো।

আজ আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। একটু যদি যোগাযোগ থাকে তাতে আজ কারো কোনো ক্ষতি হবে না। কমপিউটারের মাধ্যমে মানুষ কতো দূরদূরান্ত থেকে প্রতিদিন যোগাযোগ রাখে। আমার কথা কখনো কি তার মনে পড়ে?

জানি, আমি তার কেউ না। আমার ধারণা, সে যতো দূরেই থাকুক না কেন, যায়যায়দিন পড়ে। তাই তার কাছে জানতে ইচ্ছা করে, আমার দেয়া বকুল ফুলের মালাটা সে কবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল?

তোমাকেই বলি, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা তোমার পক্ষে অনেক সহজ। তাই ইচ্ছা হলে যোগাযোগ করতে পারো।

শ্যামলী, ঢাকা থেকে

সুখী

– পুলক আহমেদ

১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে সেতু ছোট একটা চিরকুটে জানিয়েছে, কাল আমি শাড়ি পরবো, তুমি অবশ্যই পাঞ্জাবি পরে আসবে। তুমি যদি আমার এই সামান্য ইচ্ছাটা পূরণ করো তাহলে কালকে তুমি যা চাবে তা–ই পাবে।

পোশাকের মধ্যে এই পাঞ্জাবি জিনিসটায় আমার দারুণ এলার্জি। এর চেয়ে কিছু না পরে আসতে বললেও খুশি হতাম। অথচ সেতু বলে আমাকে পাঞ্জাবিতেই নাকি বেশি মানায়। বছরে মাত্র দুই দিন অর্থাৎ কোরবানি ঈদে একবার আর রোজার ঈদে একবার, গুণে গুণে মোট এই দুবার আমার পাঞ্জাবি পরা হয়ে ওঠে। ওই একটা মাত্র পাঞ্জাবি আমার ছাড়া দিনের পর দিন তার নির্দিষ্ট জায়গায় মুখ বুজে পড়ে থাকে।

অদ্ভুত এক শিহরণে রাতে ভালো ঘুম হলো না। ওই চিরকুটের একটি লাইন বার বার মনে পড়ছে। *তুমি যা চাবে তা–ই পাবে।*

আহা! এই মধুর সম্পত্তির জন্য কতোদিন অস্থিরভাবে অপেক্ষা করেছি তা শুধু আমার মতো ভুক্তভোগী প্রেমিক মাত্রই বুঝবে, অন্য কেউ নয়। এতোদিন একটু হাত ধরা, জড়িয়ে ধরা, নিদেনপক্ষে একটা চুমু, তাও ঠোটে নয়। এর বেশি এগোতে দেয়নি। আগামীকালের এ সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। মনে মনে অসংখ্যবার ওই বেটা প্রয়াত ভ্যালেনটাইনকে ধন্যবাদ দিলাম।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে সব কিছু ভালোমতোই চলতে লাগলো। বড় ভাইয়ের ফোম দিয়ে শেভ, ছোট ভাইয়ের শ্যাম্পু দিয়ে গোসল। সবচেয়ে কঠিন কাজ মায়ের কাছে চাওয়া মাত্র দুইশ টাকা হাতে পাওয়া। সবই ঠিকমতো চলতে লাগলো। তখন বিপত্তি ঘটলো যখন পাঞ্জাবি পরতে গেলাম। পোল্ট্রি ডিমের সাইজ আস্ত একটা ফুটো আমার পাঞ্জাবির বুকে। এখন কি হবে? যেন এ ফুটো পাঞ্জাবির বুকে নয়, আমার নিজের বুকে হয়েছে। রাগে–দুঃখে আমার কাদতে ইচ্ছে করছে। এখানে পাঞ্জাবি নষ্ট হওয়ার চেয়ে যা চাই তা আজ পাবো না ভেবে মনটা যন্ত্রণায় কুকড়ে উঠলো।

অগত্যা মায়ের সাহায্যে বাবার একটা পাঞ্জাবি পরে বের হলাম।

নিউ মার্কেটে ফুলের দোকানে গিয়ে ঘটলো আরেক বিপত্তি। এ যেন রীতিমতো ফুল কেনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এই শহরে এতো প্রেমিক–প্রেমিকা আছে তা ফুলের দোকানে না এলে বুঝতে পারতাম না। তাদের মতো একজন প্রেমিক হিসেবে নিজেকে নিয়ে এই মুহূর্তে বেশ গর্ব বোধ করছি। কিন্তু এভাবে দাড়িয়ে থাকলে আমার ভাগ্যে রজনীগন্ধার ডাটাও যে জুটবে না তা বেশ বুঝতে পারছি। আশা ছিল একগোছা কিনবো। তবে দাম শুনে মাত্র দুটা স্টিক নিয়ে রওনা হলাম আমাদের নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে।

আমার আগেই সেতু চলে এসেছে।

এতো দেরি করলে কেন?

ফুল কিনতে গিয়ে।

মাত্র দুটা স্টিক! বুড়ো মানুষের পাঞ্জাবি পরেছো কেন?

হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে সেতু।

ঠিক আছে। এই নাও, অনেক ঘুরে মানিব্যাগটা পছন্দ করে কিনেছি।

শুধু মানিব্যাগ, ভেতরে মানি নেই?

আছে। পাচশ টাকার একটা নোট আছে।

থ্যাংকস ডারলিং।

হয়েছে হয়েছে। এবার দয়া করে একটা রিকশা নাও, তারপর তোমার যেখানে ইচ্ছে আমাকে নিয়ে উদ্ধার করো।

রিকশায় সেতুর পাশে বসে পৃথিবীর সুখী প্রেমিক বলে মনে হচ্ছে নিজেকে। বেকার প্রেমিকের এমন সুন্দরী প্রেমিকা! সেতু এমনিতেই সুন্দর, তারপর আজকের এই সাজে তাকে আরো বেশি সুন্দর করে তুলেছে। নাভির অনেক নিচে শাড়ি পরেছে। পাতলা ফিনফিনে কৃম কালারের শাড়ি ভেদ করে তার কাচা হলুদের মতো গায়ের রঙ ফুটে বের হচ্ছে। বাড়ি থেকে বের হবার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে খুব যত্ন করে নিজেকে দেখে নিয়েছে নিশ্চয়। তার পাশে বাবার পাঞ্জাবি পরে কেমন যেন বেমানান মনে হচ্ছে নিজেকে।

কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছো?

এখনো ঠিক করিনি। তবে তুমি চাইলে পলাশের আপার বাসায় যেতে পারি। পলাশ বলছিল, তার আপা–দুলাভাই তাকে বাড়ি পাহারায় রেখে কোথায় যেন যাবে।

বেশ চলো।

পলাশ একাই ছিল। আপা–দুলাভাই নেই। আমার হার্ট বিট হঠাৎ বেড়ে গেল। সেতু কি নিয়ে যেন বক বক করেই চলেছে – সেদিকে আমার কোনো খেয়াল নেই। ফাকা বাসা। ছিমছাম গোছানো, নরম বিছানা দেখে ভেতরে ভেতরে আরো অস্থির হয়ে উঠেছি। আমাদের দুজনকে রেখে পলাশ বের হয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, এখন থেকে ঠিক দুই ঘণ্টা পর ফিরবো। আমাকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললো।

দরজা বন্ধ করে সেতুর পাশে এসে বসলাম।

সেতু খুব স্বাভাবিকভাবে রিমোট হাতে একটার পর একটা চ্যানেল বদলিয়ে চলেছে।

রিমোট হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিছানায় ছুড়ে ফেললাম। তারপর তাকে দাড় করিয়ে আমার বুকের সঙ্গে শক্ত করে আকড়ে ধরলাম।

এই, কি হচ্ছে? ছাড়ো। আমার দম বন্ধ হয়ে গেল।

না। আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না। তুমি বলেছো আজ যা চাইবো, তুমি তা–ই দেবে। আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না।

সেতুর গলা, চিবুক, গালে চুমুতে চুমুতে ভরে দিচ্ছি আর কথা বলছি। তার বুক থেকে শাড়ি পড়ে গেলে আরো হিংস্র হয়ে উঠলাম। আমার অবাধ্য ঠোট কখনো তার বুকে, কখনো পেটে অনবরত চষে বেড়াতে লাগলো। সেতুর নিঃশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। তার কাছ থেকে এবং কোনো বাধা আসছে না। এই কুসুম কুসুম শীতের মধ্যেও সে বেশ ঘেমে উঠেছে। ভেজা ভেজা ঘাম আর পারফিউমের গন্ধে এক আলাদা মাদকতায় ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি যেন। এবার আমার ঠোট তার ঠোটে ডুবিয়ে দিলাম। দুজনই চুষে নিচ্ছি একে অপরের অমৃত সুধা।

হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে সেতু বিছানায় বসে পড়লো। সেতু হাপাচ্ছে। তার শাড়ির একাংশ মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। সেই সঙ্গে তার সুউচু বুকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে। ঘামে ভেজা মুখখানিতে এক অদ্ভুত আভা ফুটে উঠেছে।

আমি হাটু ভেঙে সেতুর সামনে বসে পড়লাম।

কি হলো? তুমি এমন করছো কেন?

পুলক, আমাকে আজ মাপ করে দাও। তুমি যা চাও তা আমিও চাই। কিন্তু বিয়ের আগে আমরা এর বেশি আর এগোতে চাই না। প্লিজ হেলপ মি!

সেতুর মুখের দিকে তাকিয়ে এক নিমিষে শীতল হয়ে গেলাম। তার কপালে একটা চুমু দিয়ে বললাম, বেশ, তাই হবে।

এবার সেতু আমার বুকের ওপর মাথা রেখে ডুকরে কেদে উঠলো।
আমি হেরে গেলাম পুলক।
না সেতু, তুমি হারোনি। বরং বলো, আমার দুজনই জিতে গেলাম। পরিস্থিতিও আমাদের হারাতে পারেনি।
আমাদের বিয়ের বয়স চার বছর চললো। আমার চাকরির সুবাদে একটি মফস্বল শহরে দুই রুমের একটা ছোট বাসায় আমরা সংসার পেতেছি। স্বল্প আয়ের এই চাকরিতে প্রতিদিন গোছা গোছা ফুল কিনতে না পারলেও অন্তত একটা ফুলকপি নিয়ে ঘরে ফিরতে পারি। তবুও আজ আমরা সুখী।

রাধানগর, পাবনা থেকে

দ্বিচারিণী

– মোহাম্মদ কামরুল হাসান তুহিন

আমার দেখা মতে সবচেয়ে সুখী মানুষ হচ্ছে শাহীনভাই। এই পৃথিবীতে কোনো মানুষই হান্ড্রেড পারসেন্ট সুখী হতে পারে না। কিন্তু শাহীনভাই পুরোপুরি সুখী। তাকে দেখে আমার মাঝে মধ্যে হিংসে হয়। টাকা–পয়সার কোনো অভাব নেই। এই শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ঘরে সুন্দরী বৌ। সব মিলিয়ে একশতে একশ।
শাহীনভাই আমাকে তার আপন ছোট ভাইয়ের মতো মনে করেন। বয়সের ব্যবধান ধাকা সত্ত্বেও আমরা ফ্রেন্ডলিভাবে চলাফেরা করি। মাঝে মধ্যে শাহীনভাইয়ের অফিসে যাই। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মাঝে আলোচনা হয়। বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপট, আন্তর্জাতিক বিষয়, ক্রীড়াঙ্গন ইত্যাদি।
আমাদের আলোচনার এক পর্যায় শাহীনভাই তার বউয়ের কথা তোলে। তার বৌয়ের প্রশংসা শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কথার ফাকে তিনি বলবে, জানিস, তোর ভাবীর মতো মানুষ হয় না। ওর হাতের রান্না যা চমৎকার, তুই না খেলে বুঝতে পারবি না। আমার কথা ছাড়া...ইত্যাদি।
তার কথা শুনে আমার ইচ্ছে করে একদিন তার বৌকে দেখতে যাবো। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে যাওয়া হয় না।
আজ সকালে আমার মোবাইলে শাহীনভাই ফোন করে বললো কি ব্যাপার, কয়েকদিন ধরে খুজে পাচ্ছি না! দুপুরে অফিসে আসবি, তোর সঙ্গে কথা আছে।
দুপুরে তার অফিসে গেলাম।
তিনি বিরক্তি নিয়ে আমাকে বললেন আমাদের দেশটা অনিয়মে ভরে গেছে।
জানতে চাইলাম – কেন?
গত কয়েক মাস ধরে টিএন্ডটির ভুতুড়ে বিল আসছে।
ভুতুড়ে বিল মানে?
স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বিল আসছে। সারা দিন বাসায় থাকি না, ফোন করার মানুষ নেই।
ভাবী হয়তো তার আত্মীয়দের কাছে ফোন করেন।
না, তোর ভাবী সে রকম না। এ যুগের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের চেয়ে আলাদা।
ঠিক আছে, টিঅ্যান্ডটি অফিসে রিপোর্ট করেন। আমার এক বন্ধু টিঅ্যান্ডটি–তে চাকরি করে। ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করবো।
কথা বলতে বলতে শাহীন ভাই উঠে দাড়ালেন। বললেন, ক্ষিধে পেয়েছে। চল লাঞ্চটা সেরে ফেলি।
আমি এবং শাহীনভাই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খাবারের অর্ডার দিলাম।
খাওয়ার পর শাহীনভাই বললেন, গতকাল জুয়েল এসেছিল। এসেই রিনিকে ফোন করলো।
রিনিকে ফোন করেছে?

হ্যা, অনেকক্ষণ কথা বলেছে। তোকে একটা প্রশ্ন করি, সত্যি উত্তর দিবি?

কি প্রশ্ন!

তুই কি রিনিকে ভালোবাসিস?

অবাক হয়ে শাহীনভাইয়ের দিকে তাকালাম। তিনি এমন একটা প্রশ্ন করবেন ভাবতে পারিনি। নিশ্চুপ রইলাম।

শাহীনভাই আবার বললেন, তোর সঙ্গে রিনির কথা হয়?

না, ফোন করলে বিরক্ত বোধ করে। তাই ফোন করি না।

অথচ জুয়েলের সঙ্গে ওর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হয়। শুধু জুয়েল নয়, অনেক ছেলের সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়। হঠাৎ করে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। রিনির কথা মনে হতেই আনমনা হলাম। রিনির সঙ্গে পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বে রিনির আগ্রহটা বেশি ছিল। আমার জন্মদিনে রিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে কার্ড পাঠিয়েছিল। সেই থেকে যাত্রা শুরু। আমাদের মধ্যে ফোনে কথা হতো, চিঠি লেন-দেন হতো, কার্ড পাঠাতো, নানান রকম গিফট পাঠাতো। কিন্তু কখনো আমাদের অভিসার হয়নি।

হঠাৎ করে আমি ফোন করা বন্ধ করে দিলাম। শুধু চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হতো। রিনি কখনো সরাসরি কিছুই বলতো না। সম্পর্কের স্বীকৃতি দিতো না। আমাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ ভেবে টেনশনে ছিলাম।

তখন জুয়েল আমার পাশে এসে দাড়ালো। বলল একটা মেয়েকে নিয়ে এতো টেনশন করার কিছুই নেই। আমাকে ফোন নাম্বার দে, তোর সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি।

এরপর জুয়েলকে ফোন নাম্বার দিলাম। কিন্তু আমার টেনশন কমেনি, বরং বেড়েছে। এখন আমার সঙ্গে রিনির যোগাযোগ বন্ধ। কিন্তু জুয়েলের সঙ্গে এখনো ফোনে কথা হয়।

শাহীনভাই বললেন, কি ব্যাপার, কি ভাবছিস?

না, কিছু না।

তোর ভালোর জন্যই বলছি, রিনিকে তুই ভুলে যা। যে মেয়ে তোর মোবাইলে একটাও ফোন করেনি, অথচ অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে আলাপ করে তার কাছে ভালো কিছু আশা করা যায় না। এ জাতীয় মেয়েদেরকে নিয়ে কখনো সুখী হওয়া যায় না।

চুপচাপ তার কথা শুনলাম। শাহীনভাইয়ের শেষ কথাটি বার বার আমার কানে এসে লাগলো *এ জাতীয় মেয়েদেরকে নিয়ে কখনোই সুখী হওয়া যায় না।*

শাহীনভাই প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, আজ অফিসে কোনো কাজ নেই।

বললাম, তাহলে বাসায় চলে যান। ভাবীর সঙ্গে বসে বসে গল্প করবেন। ভাবী নিশ্চয়ই সারা দিন বাড়িতে একা থাকেন।

তোর ভাবী আজ বাড়িতে নেই, বেড়াতে গেছে। আগামীকাল আসবে।

তাহলে চলেন দুজন মিলে পুরো ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াবো। আজ আমারও কোনো কাজ নেই।

তারচেয়ে ভাল হবে বাসায় চলে যাই। অনেক দিন তোর সঙ্গে দাবা খেলি না।

মহা আনন্দে বললাম, ঠিক আছে, আজ দাবা খেলবো।

শাহীনভাইয়ের সঙ্গে তার বাসায় গেলাম। বিয়ের পর এই বাড়িতে আর আসা হয়নি। ড্রয়িংরুমে ঢুকেই বুঝতে পারলাম, এটি একটি সুখী মানুষের বাড়ি। এখানে একটি সুখী পরিবার বসবাস করে।

আমাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে শাহীন ভাই ভেতরে গেলেন ড্রেস চেঞ্জ করতে। আমি ভালোভাবে তার ড্রয়িংরুমটা দেখতে লাগলাম। প্রতিটি কোণায় সুখের পরশ ঝোলানো। দেয়ালে কয়েকটি ছবি ঝুলছে। একটি ছবির দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। ছবিতে শাহীনভাই এবং বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবতী। অতুলনীয় সুন্দরী।

শাহীনভাইয়ের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ। হয়তো এটি তার স্ত্রী। আমি ভালোভাবে ছবিটা লক্ষ্য করলাম। মনে হলো, মেয়েটা আমার অনেক দিনের পরিচিত। কোথায় যেন পরিচয় হয়েছিল, কথা হয়েছিল ঠিক মনে করতে পারছি না।

এর মধ্যে শাহীনভাই দাবা নিয়ে এলেন। বললেন, কি দেখছিস? এটাই তোর ভাবী।

আমরা দাবা খেলতে শুরু করলাম।

শাহীনভাই আমার কয়েকটা সৈন্য খেয়ে ফেলেছেন, রাজা চেক।

খেলায় মনোযোগ দিতে পারছি না। মাথার মধ্যে শুধু ঘুরতে লাগলো ছবির এই মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছি।

হঠাৎ মনে পড়লো, গত বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে-তে রমনায় শামীমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এই মেয়েটি শামীমের সঙ্গে ছিল। শামীম বলেছিল ওর নাম শিল্পী।

এরপর আরেকদিন হঠাৎ আমার বাসায় এসে শামীম উপস্থিত হলো সঙ্গে সেই শিল্পী। শামীম বলল দোস্ত এক ঘণ্টার জন্য তোর রুমটা দিবি! আমরা কথা বলবো। খুবই ইমপর্টেন্ট কথা। সেদিন শামীমকে সুযোগ দিয়েছিলাম। আড়ালে শামীমকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মেয়েটি কে?

শামীম বলেছিল এক বিত্তমানের স্ত্রী। আমাকে ভালোবাসে। আমার জন্য পাগল প্রায়। আমিও মজা লুটে নিচ্ছি।

শাহীনভাই ধমক দিয়ে বললেন, কি ভাবছিস?

কিছু না।

বুঝেছি, আবার সেই রিনির কথা ভাবছিস। একটা কথা মনে রাখবি, কোনো দ্বিচারিণীকে নিয়ে কখনো সুখী হওয়া যায় না।

প্রতিবাদ করতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। *দ্বিচারিণী* শব্দের অর্থ জানি না। ছেলেদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেই কি দ্বিচারিণী হয়ে যায়? বুকের মধ্যে ব্যথা অনুভব করলাম।

শাহীনভাই বললেন, তোর ভাবীর জন্য আমার জীবন পূর্ণতা পেয়েছে। ওর ভালোবাসার স্পর্শে আমি একজন সুখী মানুষ।

মনে মনে ভাবলাম যদি শাহীনভাইকে বলি, আপনার স্ত্রী কুলটা, দ্বিচারিণী তাহলে তার জীবন থেকে সুখ নামের শব্দটা চিরতরে চলে যাবে।

বললাম, সত্যিই আপনি একজন পরিপূর্ণ সুখী মানুষ।

সব কিছু দেয়ার মালিক আল্লাহ্। সে-ই আমাকে সুখী বানিয়েছে।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন হলো জানি না।

রিনির জন্য, নাকি শাহীনভাইয়ের জন্য তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পল্লবী, ঢাকা থেকে

অভিজ্ঞতা

– এস.আর ঢেউ

আমি, আমার স্ত্রী আর আমাদের তিন বছরের সন্তান সকাল আনুমানিক এগারোটায় বের হলাম শপিংয়ে। পথিমধ্যে একটি বইয়ের দোকানের সামনে রিকশাটি দাড় করলাম এবং আমি ও আমার সন্তান বইয়ের দোকানে ঢুকলাম। আমার স্ত্রী রিকশায় বসে রইলো। হঠাৎ দেখি দুটি ছেলে হাতে ফুল নিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে

এলো। প্রথমে আমি হচকচিয়ে গেলাম। তারপর মনে পড়লো আজ ভালোবাসা দিবস। বলে রাখি, স্ত্রী এবং আমার বয়সের তফাত বেশ বড়। গ্রামের মেয়ে, তেমন কিছু জানে না। শহরের আধুনিকতার সঙ্গে সবে মানিয়ে নিচ্ছে।

ছেলের দল আমার স্ত্রীকে সম্ভবত অবিবাহিত মনে করেছিল। তাই দুজন সাহস করে এসে বললো, আপা, আপনি কি একা?

আমার স্ত্রী কি করবে বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

বিষয়টি আগেই আচ করতে পেরেছিলাম। তাই আমার বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, যাও, তোমার আম্মুর কাছে গিয়ে বসো।

আমার স্ত্রীর নীরবতায় ছেলেটি আরো এক ধাপ এগোলো। সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ফুলটি আপনার জন্য, নিশ্চয় আপনি ফাকা।

এমন সময় বাচ্চাটি আমার স্ত্রী কাছে গিয়ে বললো, আম্মু, আমি ফুল নেবো।

বাচ্চার মুখে আম্মু ডাক শোনা মাত্রই ছেলেটি বিস্মিত হলো, যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তারপর ফুলটি বাচ্চার হাতে দিয়ে *সরি আন্টি* বলে যুবকরা লজ্জায় কাতুকুতু খেয়ে সটকে পড়লো।

দোকান থেকে আমি জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। হঠাৎ শুনলাম আরো হাসির শব্দ। পাশে তাকিয়ে দেখি দোকানের কর্মচারী এবং মালিক বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। তাই তাদের মুখেও ভালোবাসার হাসি।

সেদিন সেখান থেকে রিকশায় করে বাহাদুর বাজারে রওনা হই। যেতে যেতে স্ত্রীকে বোঝালাম আজ ভালোবাসা দিবস। তোমাকে কুমারী ভেবে তারা প্রেম নিবেদন করতে এসেছিল। কিন্তু বাচ্চাটির জন্য হলো না। বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝানোর জন্য যায়যায়দিন পত্রিকার *ভালোবাসা* সংখ্যাটি কিনে স্ত্রীকে উপহার দিলাম। কারণ, যায়াযদিনই একমাত্র পত্রিকা যেখানে বিষয়টি পুরোপুরি উপস্থাপন করা হয় এবং তারাই প্রথম বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস উদযাপনের আয়োজন করে।

এটা ছিল গত বছরের ঘটনা।

দীর্ঘ এক বছরে স্ত্রী বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সামনে আবারও আসছে সেই দিবস। নিশ্চয় এবার আমার স্ত্রী এই দিবসটি উদযাপন করবে সাড়ম্বরে। তাই আমার স্ত্রীকে তাক লাগিয়ে দেয়ার জন্য তার প্রথম অভিজ্ঞতা লিখে পাঠালাম। যাযাদি যদি প্রকাশ করে তবে অবশ্যই সেটি হবে আমার স্ত্রীর জন্য ভ্যালেনটাইনস ডে-র সারপ্রাইজ গিফট।

মুদিপাড়া, দিনাজপুর থেকে

জন ম্যাকরে

– মাহমুদ আলম খন্দকার মামুন

ইরাক সীমান্তে কুয়েতের একটি ছোট শহর আল জাহরা। এখানে একটি ইলেকট্রনিক গেমসের শো রুমে সেলসম্যান হিসেবে কাজ করি। যার কথা আজ লিখবো বলে ঠিক করেছি সে জন ম্যাকরে। বৃটিশ সোলজার। শহরের শেষ প্রান্তে সীমান্তে তাদের ক্যাম্প।

তার সঙ্গে আমার পরিচয় গত বছরের প্রথম দিকে, ইরাক যুদ্ধের আগে। ক্যাম্পে থেকে সে স্কোয়াডের সঙ্গে ইরাক যায়, আবার কিছুদিনের ব্যবধানে ফিরে আসে। যেদিনগুলো সে ক্যাম্পে থাকে তার প্রায় প্রতিদিনই সে আমাদের শো-রুমে আসে। লেটেস্ট রিলিজড গেমসগুলো খেলে অথবা কিনে নিয়ে যায়। আমার সঙ্গে বিভিন্ন গেমস কনসোল নিয়ে কথা বলে, আলোচনা করে। এভাবেই তার সঙ্গে আমার একটা সখ্যতা গড়ে ওঠে।

তাকে জন বলে ডাকি। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে তার বাড়ি। দুই ভাই ও এক বোনের ছোট ফ্যামিলি। মা–বাবা তাদের সঙ্গেই থাকেন। তার মা জাতিতে আইরিশ।

স্পোর্টসের দারুণ ভক্ত এই ইংলিশ যুবক। ইংলিশ ফুটবল ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–এর গোড়া ফ্যান সে। ডেভিড বেকহ্যাম তার প্রিয় খেলোয়াড়। আমিও স্পোর্টসপাগল। সুতরাং জন–এর সঙ্গে খুব অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দারুণ আন্তরিকতা হয়ে যায়।

আমি বাংলাদেশি জেনে সে বলে, বাংলাদেশের কথা সে শুনেছে। কিন্তু দেশটি ঠিক কোথায় তা সে সঠিক বলতে পারে না।

কথা প্রসঙ্গে সে একদিন বলে, আমি পত্রিকায় পড়েছি ও অন্যদের কাছে শুনেছি, বাংলাদেশে নাকি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রায়ই হয় এবং দেশটিতে উগ্র মৌলবাদ বিরাজমান।

মনে মনে বলি, আমাদের অবিবেচক, ক্ষমতালোভী, বাচাল বিরোধী দলীয় নেত্রীর কল্যাণে দেশটির ইমেজ বহির্বিশ্বে কতোটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা এ ইংরেজ যুবকের কথাতেই বোঝা যাচ্ছে।

জনের কথার প্রতিউত্তরে বলি, জন, তুমি কোথা থেকে এটা শুনেছো, কার থেকে শুনেছো জানি না। তবে তোমার কথাটি মোটেও সত্যি নয়। আমাদের দেশের মানুষ খুবই অসাম্প্রদায়িক, উদার, অতিথি পরায়ণ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জাতি–গোষ্ঠির সংস্কৃতির লোকজন পাশাপাশি বসবাস করে আসছে খুবই সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে যা তুমি পৃথিবীর অনেক উন্নত রাষ্ট্রেও দেখতে পাবে না।

জবাবে জন বললো, ডোন্ট মাইন্ড, আই অ্যাম সরি। তবে তোমাদের একজন স্পোর্টসম্যানের নাম আমি শুনেছি, ব্রজেন দাস।

অত্যন্ত বিস্মিত হলাম জনের কাছ থেকে ব্রজেন দাসের নাম শুনে। গর্বে বুক ভরে উঠলো। তারপর জনকে বললাম, ব্রজেন দাস শুধু এক দুইবার নয়, বেশ কয়েকবার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন।

ওই দিন এ পর্যন্তই আমাদের কথাবার্তা সীমাবদ্ধ থাকে।

জন এক সানডে–তে আমাকে তার ক্যাম্পে আমন্ত্রণ জানালো।

শহরের বেশ বাইরে বর্ডার ঘেষে খোলা মরুভূমির ওপর তাদের ক্যাম্প। কড়া নিরাপত্তার মাঝেও আমার ভেতরে ঢুকতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। গেটে জনের আইডি নাম্বার ও নাম বলতেই একজন জনকে ডেকে আনে।

তারপর সিকিউরিটি চেকআপের পর ক্যাম্পে ঢুকি।

জনের রুমে গিয়ে তার অনেক সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। জনই পরিচয় করিয়ে দিল। এ হচ্ছে লালচুলো স্টুয়ার্ট, এ হচ্ছে পেটুক মার্ক, সে হচ্ছে মুটকো ডেভিড। এ রকম অনেকের সঙ্গে।

রুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলাম। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ডেভিড বেকহ্যামের বড় দুটি পোস্টার দেয়ালে সাটা। এক পাশে দেখলাম পপ সিঙ্গার রবি উইলিয়ামস–এর একটি পোস্টার।

জন আমাকে পিজ্জা, বিফবার্গার, পেপসি দিয়ে আপ্যায়ন করলো। হালকা খাবারের পর জন তার ফটো অ্যালবাম দেখাতে লাগলো। প্রথমেই দেখালো ডেভিড বেকহ্যাম–এর সঙ্গে তোলা তার ফটো। তারপর তার বাবা–মা, ভাই–বোন, বন্ধুদের ফটো। সবশেষে দেখালো তার প্রেমিকা ক্যাথির ফটো। সোনালি চুলের, নীল চোখা এক অসাধারণ সুন্দরী।

জন বললো, এ বছরের শেষে কৃসমাসের পর তাদের বিয়ে ঠিক করা আছে। কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ক্যাথি একদম পছন্দ করে না। তার পছন্দ ইটালি–র ফুটবল ক্লাব জুভেন্টাস–কে। খুব দুঃখ করলো জন।

একবার হয়েছে কি জানো, ইউয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড শোচনীয়ভাবে জুভেন্টাসকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলো। তারপর রাগে, দুঃখে ক্যাথি এক সপ্তাহ আমার সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু ক্যাথিকে ভীষণ ভালোবাসি, ভীষণ। কতোদিন তাকে দেখি না!

জনকে বাংলাদেশের কথা বললাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা, দেশের মানুষের কথা, সবুজ প্রকৃতির কথা, আমাদের সংস্কৃতি, আচার-উৎসবের কথা বললাম।

জন খুবই মুগ্ধ হলো।

বললো, ক্যাথি-কে নিয়ে অবশ্য বাংলাদেশে যাবো এবং তোমাদের বাড়িতে উঠবো।

ওই দিন বেশ হই চই করলাম জন ও তার বন্ধুদের সঙ্গে। তারপর সবাইকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

এর কিছুদিন পরই ইরাকে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বুশ ও ব্লেয়ার মরিয়া হয়ে উঠলো বাগদাদ দখলের জন্য সমস্ত বিশ্ব জনমত ও জাতিসংঘকে উপেক্ষা করে।

চূড়ান্ত যুদ্ধে যাবার কয়েকদিন আগে জন একদিন ফোন করে বললো, যুদ্ধে চলে যাচ্ছি। সময়ের অভাবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। গড-এর কাছে প্রার্থনা করো যেন ফিরে আসতে পারি।

আমি মনে-প্রাণে চেয়েছি, প্রার্থনা করেছি যেন এ যুদ্ধে আমেরিকা-বৃটিশ কোয়ালিশন পরাজিত হয়। কিন্তু মনে মনে সব সময়ই চেয়েছি জনের যেন কিছু না হয়। সে যেন সুস্থ ভাবে ফিরে আসে।

জন আমাকে প্রায়ই একটি কথা বলতো, মাহমুদ, যুদ্ধকে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি এবং বুশ ব্লেয়ার-এর আসল উদ্দেশ্য কি এটাও আমরা ভালোভাবেই জানি। যুদ্ধটা ইরাকের ওপর শুধুই ইচ্ছাকৃতভাবে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কি করবো বলো? আমি একজন সামান্য সৈনিক। সবই নিয়তি।

যাহোক, যুদ্ধের ফলাফল সবাই জানেন।

বাগদাদ পতনের মাস খানেক পরে একদিন হঠাৎ জন আমার দোকানে এসে হাজির। জন একেবারে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। খুবই খুশি হলাম জনকে সুস্থভাবে ফিরে আসতে দেখে। কুশল বিনিময়ের পর অনেক আলাপ হলো। মাঝারি উচ্চতার, কোকড়ানো চুলের, সুঠাম দেহী এই ইংরেজ যুবকের জন্য একটা মায়া পড়ে গেল।

একদিন জন বললো, কুয়েত থেকে তাদের ক্যাম্প হয়তো এ বছরের শেষের দিকে উঠিয়ে ইরাকের বসরায় নিয়ে যাবে। তখন হয়তো আর দেখা হবে না।

আমার মন খারাপ হয়ে যাবে ভেবে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, এখনই তো যাচ্ছি না। আরো বেশ কিছুদিন সময় আছে। এর মধ্যে অবশ্য মাঝে মধ্যে ইরাকে যেতে হবে। ও হ্যা, তোমাকে বলা হয়নি। আমি ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি। আশা করি কৃসমাসের বেশ আগেই ছুটি পেয়ে যাবো।

জন ম্যাকরে মারা যায় কৃসমাসের ঠিক দুই মাস আগে। স্টুয়ার্টের কাছে খবরটি প্রথমে পেয়ে বিশ্বাস করতে পারিনি।

তাদের বহনকারী লরিটি বাগদাদ থেকে কুয়েতে ফিরছিল। বসরার কাছাকাছি আসার পর তাদের ওপর হামলা হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জনসহ আরো দুজনের দেহ ঝাঝরা হয়ে যায় শত্রু পক্ষের হ্যান্ডচালিত রকেট লঞ্চার ও গ্রেনেড হামলায়।

এতোদিনে চেনা পৃথিবীটা অনেকটাই বদলে গেছে। ইরাকে যুদ্ধ অনেকটাই থেমে গেছে, সাদ্দাম হোসেন ধরা পড়েছেন। কৃসমাস পেরিয়ে আরো একটি নতুন বছর শুরু হয়েছে। কিন্তু একজন জন ম্যাকরে-কে কি কেউ মনে রেখেছে? প্রতি কৃসমাসে জনের জন্য কেউ অপেক্ষা করুক আর নাই করুক, আমার মনে সে চিরদিন কৃসমাস ট্রি হয়ে বেচে থাকবে।

কুয়েত থেকে

মাথার তাজ

– মামুন

সময় বয়ে যায়। সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন ঘটে মানুষের চিন্তা, চেতনা এবং মননে। সেই সাথে পরিবর্তন ঘটে ভালোবাসার প্রকৃতি এবং প্রকাশে। আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে আমরা নতুনরা পুরনোদের কাছে পরাজিত। আমার প্রয়াত বড় দাদা অর্থাৎ আমার দাদার বড় ভাইয়ের জীবনীই এর যথার্থ প্রমাণ।

আমার দাদা খুব অল্প বয়সেই তার বাবাকে হারান। পিতৃহীন দুই সন্তানসহ দাদার মা তার স্বামীর ভিটে থেকে উচ্ছেদ হন দেবরদের অত্যাচারে। দাদারা দুই ভাই বড় হতে থাকেন তার নানার সংসারে। বড় হয়ে পিতার সম্পত্তি উদ্ধারে দুই ভাই সক্রিয় হন। এ সময় চাচাদের ষড়যন্ত্রে সাজানো মিথ্যে মামলার আসামি হয়ে বড় দাদা পাড়ি জমান হালুয়াঘাটের গারো পাহাড়ে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এক গারো কবিরাজের। দীর্ঘ পাচ বছর ছিলেন এই গারো গুরুর সাহচর্যে। অনেক কবিরাজি বিদ্যাই তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এই গুরুর কাছ থেকে। আমাদের এলাকায় তিনি *ফরাজী কবিরাজ* হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। গুরুর আস্তানায় থাকার সময় মন দেয়া–নেয়া হয় গুরুকন্যার সঙ্গে।

প্রেমের মজনু হয়ে সমতলের দুরন্ত যুবকের আনন্দঘন দিনগুলো কাটতে থাকে পাহাড়ের চূড়ায়। এদিকে নিরুদ্দেশ ছেলের আশা প্রায় সকলেই ছেড়ে দিয়েছেন। দাদার মুখ থেকেই শুনেছি তাদের অনেক দুঃসাহসিক অভিসারের কথা। কথায় বলে, *চোরের দশ দিন, সাধুর একদিন।* তাদের এই গোপন প্রণয় একদিন ফাস হয়ে যায়। গাছের সঙ্গে বেধে অবর্ণনীয় নির্যাতন চলে দুজনের ওপর। আর কোনোদিন ও পথ মাড়াবেন না এই মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পান।

কিন্তু হৃদয়ের বন্ধন সহস্র শিকলের বন্ধন অপেক্ষা দৃঢ়। অঙ্গীকার ভঙ্গ করে গুরুকন্যাকে নিয়ে এক গভীর রাতে হালুয়াঘাট থেকে যাত্রা শুরু করেন ত্রিশালের উদ্দেশ্যে। দুদিন পর গারো মেয়েসহ হাজির হন তার পিতৃভূমিতে। হারানো ছেলেকে পেয়ে সবাই মহাখুশি! তবে বিপত্তি ঘটে গারো মেয়েকে নিয়ে। অবশেষে সব আপত্তির অবসান ঘটিয়ে বিয়ে হয় তাদের।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তারা ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু কোনো একটি দিন তাদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য ঘটেনি। আর আমার গারো দাদি তার সমস্ত মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন আমার বাবা এবং চাচাদের মাঝে। আমার বাবা এবং চাচারা তাদের এই গারো জেঠিকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা এবং স্নেহ তিনি আদায় করে নিয়েছিলেন নিজগুণে। আতিথেয়তায় তিনি ছিলেন সবার শ্রেষ্ঠ, মমতায় অজেয়। আমরা নাতি নাতনিদের আবদারের জায়গা ছিল এই দাদিটি।

১৯৯০ সালে আমার বড় দাদা ইহধাম ছাড়েন। দাদি খাওয়া–নাওয়া সব ছেড়ে দিয়েছেন। আমার বাবাকে তিনি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু তার শত অনুরোধেও এক ঢোক পানি পর্যন্ত নেননি। শুধু কেদে কেদে বলেন, *আমার মাথার তাজ নেই, আমার আর বেচে থেকে কি হবে?*

দাদার মৃত্যুর সাত দিন পর দাদী তার সহযাত্রী হলেন। আমাদের সবাইকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে রচনা করলেন প্রেমের এক মহাকাব্য।

সোনাগাজী, ফেনি থেকে

সন্দেহ

– মোল্লা আবদুর রহিম

আমার বেগমের সন্তান ডেলিভারির আরো মাস পাচেক বাকি। সংসারের কাজকর্ম করতে এখন একজন কাজের মেয়ের দরকার। ছোট বোন গ্রামের বাড়ি থেকে ছিপছিপে ফর্শা, সালমা নামের বারো তেরো বছরের একটি মেয়েকে এনে দেয়। কাজকর্মে হাত চালু আছে বটে কিন্তু দেখলে মনে হয় পল্লি কবির ভাষায়, *সাক্ষী দিচ্ছে অনাহারে ক'দিন গেছে তার।*

তার কাজকর্ম আয়ত্বে নিতে বেশি সময় লাগলো না। ধীরে ধীরে সংসারে তার কদর বেড়ে গেল। স্ত্রীর অসুস্থতায় তার স্বামীর অযত্ন হচ্ছে না। সালমা সেদিকেও খেয়াল রাখছে দেখে বেগম আরো খুশি। কাপড়–চোপড়ের বাজেট হলো।

নতুন জামা–জুতো পরে আমাকে সালাম করতে এসে কেদে দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ির কথা মনে পড়ছে বুঝি?

না, তা নয়। বললো, পুরনো ছাড়া নতুন জামা–কাপড় যে কবে পরেছি তা মনে নেই।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ভালোভাবে কাজ করে যা, যখন যা দরকার কিনে দেবো।

বেগম বললো, এখানে থাকলে তোকে আমরা মানুষ করে দেবো।

সালমা কাজ করে খায়। আজকাল আবার গুনগুনিয়ে গান গায়। কাজের ফাকে তার বাড়ির কথা, মা–বাবা, ভাই–বোনের গল্প শোনায়। তেতুলবাড়িয়ার একই গ্রামে আমাদের বাড়ি। অর্থবিত্তের জন্য এক সময় লোকে তার বাবাকে সমীহ করে চলতো। বহু বিয়ে আর জুয়া খেলে তার বাবা আজ সর্বস্বান্ত। তার সন্তানেরা এখন অনাহারে দিন কাটায়। তাই তার বাবার প্রতি ভীষণ ক্ষোভ হয়।

আট নয় মাস পরে এক নতুন সালমার আবির্ভাব হয়। চুপসানো বেলুনে বাতাস ঢুকে ফুলে ওঠার মতো তার শরীরের গঠন ফিরে এলো। চেহারায় আসে রূপ–লাবণ্য। দর্শনীয় উজ্জ্বল রঙ–এর শরীরে তাকালে মনে হয় সে এখন পূর্ণাঙ্গ নারী।

এক রাতে বাসায় এসে দেখি সালমা বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। রান্না করার সময় অনেকখানি হাত পুড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করলাম। বেলা করে ঘুম ভাঙছে দেখে কপালে হাত দিয়ে জ্বরটা বেড়েছে নাকি দেখছি।

মুহূর্তের মধ্যে আমার হাতখানা তার দুই হাতে কপালে চেপে ধরলো। বন্ধ চোখের দুই পাশ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে বললো কাকা, আপনি আমাকে যে অনেক বেশি ভালোবাসেন তা বুঝি। আমার জন্য যে দরদ তার বিন্দুমাত্র যদি বাবার থাকতো তবে আমার অন্যের বাড়িতে কাজ করে খেতে হতো না।

আবেগে সে আমার কাছে সাধ্যমতো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করছিল।

লুকিয়ে বেগম আমাদের কথাবার্তা শুনেছিল।

সালমা সেরে উঠে পুনরায় কাজকর্ম শুরু করলো।

একদিন সকালে বেগম এসে নাশতা দিচ্ছিল। ওই দিকে নবজাত বাচ্চা কাদছিল।

বললাম, সালমা দিচ্ছে দিক, তুমি বাবুকে দেখো।

এ কথা শুনে তার সুন্দর মুখখানা মলিন হয়ে গেল। সোজা বিছানায় গিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো। বেগম কয়েকদিন ধরে তার বোন, ভাবী আর তার নিজস্ব সংগঠন *নারী পুনর্বাসন সমিতি*–র লোকজন নিয়ে শলাপরামর্শ করতে লাগলো। আস্তে আস্তে সালমার প্রতি কঠোর হয়ে উঠলো। অবশেষে সালমাকে বিদায় করে দেয়ার আল্টিমেটাম দিয়ে দিল।

ভালোবেসে বিয়ে করা স্ত্রীকে নিয়ে বিশ বছর সুখী দাম্পত্য জীবন কাটানোর পরও বেগম বুঝলো না সালমাকে আর তাকে ভালোবাসার পার্থক্যটা কোথায়।

আল্টিমেটাম পেয়ে সালমার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। এই বাড়ি ছেড়ে তার আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। বাড়ির কর্তা আমার কাছে বার বার আবেদন–নিবেদন করছে তাকে যেন না তাড়াই। তাই বেগমকে বুঝিয়ে বললাম, গ্রামে এখন অভাব, ফসল উঠলে না হয় তাকে পাঠিয়ে দিও, এখন থাক।

কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন কাজ হচ্ছে না। গ্রাম থেকে ছোট বোনকে আনানো হলো।

অবস্থা বুঝে রাতে সকলকে জানিয়ে দিলাম, প্রয়োজনে আমি সালমাকে গ্রামে নিয়ে যাবো। তোমরা এতো ব্যস্ত হয়ো না।

কিন্তু আমার প্রতি তারা আস্থা রাখতে পারলো না।

সকালে উঠে দেখি ভিন্ন চিত্র।

কয়েকজনের মিলে টানা হেচড়া করে সালমাকে আমার চার তলা থেকে সিড়ি দিয়ে নিচে নামাচ্ছে। সালমা গলা ফাটিয়ে চেচাচ্ছে। কাদছে আর বলছে কাকা আমাকে নিয়ে গেল। কাকা আমি যাবো না, আমাকে নিয়ে যান।

জবাই করার আগে প্রাণ বাচাতে পশুরা যেভাবে চিৎকার করে, সালমাও সেভাবে চেচাচ্ছিল। নিচে নামিয়ে জোর করে রিকশায় ওঠানোর সময় অশ্রুসিক্ত চোখে বার বার সিড়ির পথে তাকিয়ে দেখছিল তার কাকা আসছে কি না।

দাম্পত্য কলহের ভয়ে তার কাকার পক্ষে আর কিছু করা কিংবা বলা সম্ভব হলো না। রিকশা চলছে, তবুও সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে তার কাকা তাকে ডাকে কি না।

খুলনা থেকে

প্রিয় জানালা

– মাইনু

তোমার শুরুটা ছাদে আর আমার বারান্দায়। প্রথম প্রথম খুবই ভালো লাগতো। নিজেকে একটু বড়ও মনে হতো। দূর থেকে দেখেই ভালোবাসলাম, স্বপ্ন দেখলাম, হৃদয়ে তোমার ছবি আকলাম।

প্রতিদিন বিকেলে দেখা হতো। তুমি ছাদে আর আমি বারান্দায়। একবেলায় দেখে হয়তো মন ভরতো না। তাই যখন–তখন তুমিও জানালায় আসতে, তাকিয়ে থাকতে। আমিও চাই।

কোনো কোনোদিন হাত নেড়ে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করতে। যার আগা–মাথা কিছুই বুঝতাম না। তাই আমিও তোমাকে অনুকরণ করে হাত নাড়তাম।

আস্তে আস্তে তুমি দূরে সরে গেলে। তোমাকে আর জানালায় দেখতে পেতাম না। এখন তো একেবারেই না। খুব জানতে ইচ্ছা করে, কেন এখন তুমি আসো না। এবং আগেই বা কেন আসতে?

আসছে ভালোবাসা দিবসে তোমাকে জানাই অজস্র শাদা গোলাপের শুভেচ্ছা এবং অনুরোধ, নিজাম, তুমি আবারও আগের মতো করে ছাদে আসো, জানালায় আসো। হাত নেড়ে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করো, ব্যস। এটুকুই, আর কিছু চাই না তোমার কাছে। তোমাকে তুমি বলার ধৃষ্টতা ক্ষমা করো।

আজিমপুর কলোনী, ঢাকা থেকে

ছোট

বইমেলার প্রচণ্ড ভিড়ে আমার আট বছরের ছোট্ট মেয়ে চর্যা হাপিয়ে উঠেছে। বাইরে বের হওয়ার জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে।
হঠাৎ আমার চোখ স্থির হয়ে গেল। আমার ভুল হওয়ার কথা নয়। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই ভঙ্গি। মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত হয়ে কোনো বই খুজছে। কাছে যেতেই এবার তার চোখ স্থির।
বললাম, কেমন আছো রুদ্র?
উত্তর না দিয়ে বললো, তুমি ভালো আছো তো?
ততোক্ষণে আমরা মেলার বাইরে এসে খালি দেখে একটা জায়গায় বসলাম।
বললাম, আমার মেয়ে চর্যা।
মুচকি হেসে বললো, তুমি তো আগেই নাম ঠিক করে রেখেছিলে। তবে এই নাম কেন?
উত্তর না দিয়ে বললাম, তুমি তো ডাক্তার হতে চেয়েছিলে। তবে প্রকৌশলী হলে কেন?
ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, কে জানতো তুমি প্রকৌশলীকে বিয়ে করবে। যদি জানতাম তবে কখনো ডাক্তার হতে চাইতাম না।
বললাম, বিয়ে করো না কেন?
অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলে, খুজছি যদি ঠিক তোমার মতো কাউকে পেয়ে যাই তাহলে বিয়ে করে ফেলবো।
কিছু বলতে পারিনি। বলার সাহস হয়নি। বললাম, কতোদিন থাকবে?
উত্তর এলো, পরের সপ্তাহে চলে যাচ্ছি।
দীর্ঘ দশ বছর পর রুদ্রর সঙ্গে আমার দেখা।
পাশাপাশি বাসা ছিল আমাদের। তাদের বাসা থেকে আমাদের বাসার সব কিছু স্পষ্ট দেখা যেতো। তাছাড়া রুদ্র ছিল আমাদের দূরসম্পর্কীয় চাচাতো ভাই। রুদ্র ছিল আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। পারিবারিক ভাবে আমাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।
রুদ্রর তেমন বন্ধু ছিল না। বেশির ভাগ সময়ই আমাদের বাসায় থাকতো। আমার সঙ্গে সারাক্ষণ কথা বলতো। ছোট ছিল। তাই কেউ কিছু মনে করতো না। রুদ্রর মতো ভালো ছেলে বর্তমানে কয়টা আছে জানি না। তবে বেশি নেই। সে খুব ভালো ছাত্র ছিল। আমি তাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। নামাজ পড়তো। রুদ্রকে আমি ছোট ভাই হিসেবে ভীষণ আদর করতাম।
এক সময় আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো তার ব্যবহারে। দিনকে দিন বেড়েই চলছে। আমার মনকে সান্ত্বনা দিতাম, হয়তো আমারই বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। ভাবতাম, যে ছেলে তার সহপাঠী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে না, যে ছেলে কোনো মেয়ের দিকে তাকায় না সেই ছেলে তারচেয়ে চার বছরের বড় মেয়েকে নিয়ে এসব ভাবতেই পারে না।
এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।
উত্তর শুনে আমি স্থির থাকতে পারিনি। রাগে, ঘৃণায় তার ফর্শা গালে এক চড় বসিয়ে দিলাম। তাকিয়ে দেখি উপচে পড়ছে চোখের জল।
কাপা কাপা গলায় বললো, আপু, আমি তোমায় ভালোবাসি। অনেক বেশি ভালোবাসি। হয়তো কাজটা আমি ঠিক করিনি। তবে মনে রেখো, তোমার জন্য আমি সারা জীবন অপেক্ষা করবো।
আমি তাকে ঘর থেকে বের করে দিলাম।
রুদ্র খুব ভালো করেই জানতো দীপ্তকে আমি ভালোবাসি।

তিন চার দিন ধরে রুদ্র আমাদের বাসায় আসে না।

বিকেলে তাদের বাসায় গিয়ে দেখি রুদ্রর একশ তিন ডিগ্রির উপর জ্বর। চোখ, মুখ লাল হয়ে আছে। চাচিকে দেখে মনে হলো একটু আগে খুব কেদেছেন। রুদ্র তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

দীর্ঘ এক মাস তেরো দিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ হলো রুদ্র। এর মধ্যে প্রতিদিন আমাকে তার কাছে যেতে হতো। না গেলে বিভিন্ন বাহানায় ওষুধ খেতো না।

সুস্থ হওয়ার পর খুব বোঝালাম তাকে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চায় না। হাল ছেড়ে দিয়ে খুব খারাপ ব্যবহার শুরু করলাম। বিভিন্নভাবে অপমান করলাম। কিন্তু কিছুই হয় না। নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়।

প্রথমে পাত্তা দিতাম না। মনে হতো পাত্তা না দিলে হয়তো এসব পাগলামি কমে যাবে। এতো ভীতু ছেলে আমার সামনে হাত কেটে ফেললো। বেশি কিছু বললে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিতো। শীতের রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদে দাড়িয়ে থাকতো।

বলতো, খোদা আমাকে তোমার পরে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে সেটা কি আমার দোষ? আরো বলতো, আমাকে হুর দিয়েও যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কাকে নিতে চাও তাহলে আমি তোমাকেই নেবো।

রুদ্রকে অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। তাকে দীপ্তর চেয়ে অনেক অনেক বেশি বিশ্বাস করতাম। আমি কখনো তাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। কিন্তু তাকে ছোট ভাই ছাড়া ভাবতে পারতাম না।

দিন দিন রুদ্র কেমন হয়ে যেতে লাগলো। শুধু তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য নিজের মনের বিরুদ্ধে তাকে ডেকে বললাম, আমিও তোমায় ভালোবাসি রুদ্র। দীপ্ত আমায় ছেড়ে চলে গেছে। তাকে এক বিন্দু পরিমাণ ভালোবাসতে পারিনি।

শুধু কষ্ট পেতাম এই ভেবে যে, তার মতো এতো ভালো একটা ছেলেকে খোদা এতো কষ্ট দিল কেন!

নিখুত অভিনয় করতে পারতাম না। মন যেখানে সম্মতি দেয় না সেখানে কতোক্ষণই বা অভিনয় করা যায়! আমাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতো সে। নামাজ পড়তে বলতো।

মোনাজাতে সব সময় বলতাম, হে খোদা, তার মতো ভালো একটা ছেলেকে এতো কষ্ট দিও না। তাকে ফেরাও। সে যেন আমায় ভুলে যায়।

আর রুদ্র ঠিক তার উল্টো দোয়া করতো। আমার একটু কষ্ট রুদ্র সহ্য করতে পারতো না। একটু ব্যথা পেলে মনে হতো ব্যথা আমি পাইনি, সে পেয়েছে। আমার একটু মাথা ব্যথা বা জ্বর হলে তার ছটফটানি বেড়ে যেতো। তাহাজুতের নামাজ পড়া শুরু করে দিতো। আমাকে হারিয়ে ফেলবে এই ভয়ে লুকিয়ে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেল।

কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না। অথচ তখন তার বয়স মাত্র উনিশ। অনেক কষ্টে আইনের দোহাই দিয়ে শেষ পর্যন্ত থামিয়েছিলাম।

অনেক কষ্ট গোপন করে শুধু বলেছিল, তুমি আমাকে কেন তোমার মনটা দাও না আপু?

একটা ছেলে একটা মেয়ের জন্য এতো কাদতে পারে তা রুদ্রকে না দেখলে কোনোদিনই হয়তো বা জানতে পারতাম না। রুদ্র আমায় কতোটা ভালোবাসতো সেটা শুধু আমি জানি। রুদ্রর নিষ্পাপ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আমার এই কমলের আচড়ে ফুটিয়ে তোলা কোনোদিনও সম্ভব নয়।

হঠাৎ বৃত্তি নিয়ে রুদ্র অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল। ঠিক দুই মাস পর এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ধুমধাম করে আমার বিয়ে হয়ে গেল। যেদিন দেখতে এলো সেদিনই আংটি পরিয়ে দিয়ে গেল। পাত্রের ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি আছে। তাই মা বাবার দেরি সহ্য হলো না। রুদ্র জানলো না, আমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে নিঃসীম শূন্যতার মাঝে ফেলে তার কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছি।

এরপর রুদ্রর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। কিন্তু রুদ্র করেনি। বলা হয়নি, ক্ষমা করে দিও।

একদিন একটা চিঠি এসেছিল।

তুমি সুখী হও।

এছাড়া আর কিছুই লেখা ছিল না।

পড়ালেখা শেষ করে রুদ্র আর দেশে আসেনি। চাচা–চাচি অনেক কান্নাকাটি করতেন। এর মধ্যে চাচা মারা গেছেন। রুদ্র আসেনি। হয়তো রুদ্রর সঙ্গে আর দেখা হবে না। বলা হবে না আমাকে মাফ করো। বলা হবে না আর কষ্ট পেও না, বিয়ে করো। আমি তো দিব্যি সুখে আছি।

রুদ্র আবার চলে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে।

আমি জানি আমার এই লেখা রুদ্রর চোখে পড়বেই।

ক্ষমা করে দিও আমাকে।

রুদ্র আমার কাছে ছোট ভাইয়ের মতো ছিল।

কিন্তু আজ মনে হয় আমিই হয়তো তার কাছে ছোট হয়ে গিয়েছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঢাকা থেকে

মম

– আরিফ

হাতের ঘড়িটা বেশ মানিয়েছে মনে হয়। এটা সাবেরের। মনি–র কাছে শার্টটা চেয়ে বেশ দ্বিধায় ছিলাম! যদি না দেয়? বেচারার নতুন শার্ট, একদিনও গায়ে চড়ায়নি। কিন্তু চাইতেই দিয়েছিল। ইশতিয়াকের কাছে প্যান্টটা ধার করেছি। কোমরটা একটু ঢিলা। তাতে কি! বেল্ট দিয়ে পরায় খুব একটা অসুবিধা হয়নি।

এই সাজগোজের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য একটা টিউশনির সন্ধান পেয়েছি। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, ক্লাস নাইনে পড়ে। তাকে পড়াতে হবে। পাছে ছুটে যায় এই ভয়।

মনির কাছে যখন কয়েকটা টাকা ধার চাইলাম সে দিয়েছিল। আজ সবাইকে বেশ উদার মনে হচ্ছে। অন্যদিন এমনভাবে থাকায়, নিজের ওপর ঘেন্না ধরে যায়। কিন্তু লজ্জা নামের বস্তুটা অনেক আগেই বিসর্জন দিয়েছি। যার মুখে, হাতে পায়ে অভাবের চিহ্ন তার লজ্জা শোভা পায় না। বের হওয়ার সময় সুমন বলছিল, গুরু, বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। পটাতে পারলে তোমার কম্মো সারা।

কথাটায় মনে কিছুটা ছাপ রেখে গেল। কিন্তু মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ, আর কিছু না হোক, টিউশনিটা যেন হয়। অভাবের এ জীবন আর ভালো লাগে না।

বাড়িটা গুলশানের অভিজাত এলাকায়। বাড়ির সামনে গিয়েই কেন ভয় ভয় করছিল। দারোয়ানকে বলতেই গেট খুলে দিল।

ভেতরে ছোট্ট রাস্তা। তার চারধারে কয়েক জাতের ফুল গাছ চোখে পড়লো। কয়েকটা চিনলাম, কয়েকটা চিনলাম না। মনে হয় বিদেশি। এতো দামি ড্রয়িংরুমে বসতে দ্বিধা হচ্ছিল।

প্রথমে ছাত্রীর মা এলেন। কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। কি পড়ি, কোথায় থাকি? ইত্যাদি।

আমার দীন হীন চেহারায়, নাকি আমার স্পষ্ট কথাবার্তায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন বুঝলাম না। তবে টিউশনিটা হয়ে গেল। কিন্তু আজ ছাত্রী বাসায় নেই। তাই পড়াতে হবে না। ছাত্রীর নাম জানলাম পিংকি।

পরের দিন গেলাম। আজ কাজের মেয়ে ড্রয়িংরুমে না বসিয়ে আলাদা একটা ছোট রুমে বসালো। ছাত্রীর মাকে কোথাও দেখলাম না। ভাবছিলাম ছাত্রী কেমন হবে – একটু উচ্ছৃঙ্খল টাইপের, বেয়াড়া ধরনের, পড়ালেখায় অমনোযোগী। বড়লোকের ছেলেমেয়েরা স্বভাবত যা হয় আর কি!

আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো এমনিতেই ফাস্ট। তার উপর এসব এলাকা আরো বেশি ফাস্ট। পড়াতে মনে হয় কষ্টই হবে।

স্যার আসবো?

ভাবনায় ছেদ পড়লো। কণ্ঠটা বেশ মিষ্টি। ফিরে তাকালাম। কিশোরী একটা মেয়ে, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখটা একটু লজ্জাবনত। আমি একটু অবাক, দ্বিধা কাটিয়ে বললাম, এসো।

সে এসে চুপচাপ বসে পড়লো।

প্রায় তিন মাস হলো পিংকিংকে পড়াচ্ছি। প্রথম প্রথম তেমন একটা কথা বলতো না। শুধু কিছু বললে তার উত্তর দিতো। আজকাল আমার দিকে তার কিছুটা আগ্রহ জন্মেছে মনে হয় অথবা কিছুটা কৌতূহল হয়ে থাকবে।

সেদিন হঠাৎ করেই বলছিল, স্যার, আপনি সব সময়ই মনমরা হয়ে থাকেন কেন?

আমি তো তাকে আমার অভাবের কথা বলতে পারি না। তাই চুপ হয়ে রইলাম।

আবার একদিন হঠাৎ করেই বললো, স্যার, আপনার ভালো শার্ট নেই?

আমার প্রতি তার এই অযাচিত কৌতূহল মনে শংকা জাগায় আবার কিছুটা ভালোও লাগে। বন্ধু সুমনের প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে যায়।

একদিন হঠাৎ পড়া শেষে পিংকি বললো, স্যার আপনাকে একটা গিফট দেবো। আপনাকে নিতেই হবে।

বেশ বিব্রতভাবেই গিফটি নিলাম। নেয়ার সময় সে বলে দিল, তার সামনে যেন না খুলি।

রুমে এসে যখন প্যাকেটটি খুললাম তখন দেখলাম সুন্দর একটা চেকের শার্ট। কেন জানি না, আমার চোখে জল এসে গেল। শার্টটি তুলতেই একটা ছোট্ট চিরকুট গড়িয়ে পড়লো। তাতে লেখা : *স্যার একটু হাসি–খুশি থাকতে পারেন না? হাসলে আপনাকে খুব সুন্দর দেখায় – পিংকি।*

অবশেষে আমার আশংকা সত্যি হতে যাচ্ছে! আনন্দে একবার লাফ দিয়ে উঠলাম। পরক্ষণেই আমার বিবেক আমাকে বাধা দিল। আমি যদি এই দীন হীন জীবনের সঙ্গে তাকে জড়াই তাহলে সেটা হবে একটা চরম প্রতারণা। পিংকি–র এই কিশোরী মনের আবেগ আমাকে কয়েকদিন না দেখলেই মরে যাবে। তাই টিউশনিটা ছেড়ে দিলাম।

আজ সময়ের আবর্তে বুয়েটে পড়ি। সেদিন এক কাজে গুলশানে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে আমার সামনে থামলো। জ্যামে আটকে গেছে। পিংকি না? হ্যা পিংকিই তো। পাশে ওই ছেলেটা তার হাত ধরে আছে কেন? ভালো করে দেখার আগেই জ্যাম ছুটে গেল।

বুকে একটু কষ্ট অনুভব করলাম কি? কষ্ট তো হওয়ার কথা নয়। আমিই তো তাকে ছেড়ে এসেছি।

মন তুমি বড়ই অদ্ভুত! যখন সে আমার ছিল তখন তাকে চাওনি। তার প্রয়োজন বোধহয় ছিল না। আজ যখন সে অন্যের, তাকে পাওয়ার জন্য তোমার এই ব্যাকুলতা কেন?

ঢাকা থেকে

সূচনা

– এসএম মাসুদ রানা

মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছেলে নয়ন। এসএসসি–তে এ–প্লাস পেয়েছিল। স্যারদের ধারণা, ইন্টারমিডিয়েটেও সে ভালো রেজাল্ট করবে। পরীক্ষা শেষ হয়েছে কয়েকদিন হলো। এখন তার অফুরন্ত অবসর। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিউশনি করবে। তাতে অন্তত সময় কিছুটা কাটবে।

যেই কথা সেই কাজ। ভালো ছাত্র বলে টিউশনি পেতে দেরি হয় না। টিউশনি ঠিক হয় পাশের বাড়িতে। ছাত্রী তার ঐশী। এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। নয়ন তাকে পড়াতে থাকে।

সে কখনো ভালো করে তাকায়নি তার দিকে। সে ঐশীর টিচার আর ঐশী তার ছাত্রীই এটুকুই সম্পর্ক দুজনার মাঝে।

একদিন ঐশী অংক কষছিল। নয়নের দৃষ্টি যায় ঐশীর দিকে। চমকে ওঠে সে! বেশ সুদর্শনা, সুকেশী, মোহনীয় চেহারা, টানা টানা দুটো আখি, কাজল কালো ভ্রূযুগল, রক্ত জবার মতো লাল ঠোঁট, তুলতুলে গাল এ সবই নয়নের হৃদয়ে আচড় কাটে। তার ভালোলাগতে শুরু করে ঐশীকে। কিন্তু নয়ন তার টিচার। সে ধিক্কার দেয় নিজেকে। এসব ভাবা তার উচিত হচ্ছে না। সে এখন শিক্ষক। শিক্ষকের সাজে না ছাত্রীর প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকানো!

দিন গড়াতে থাকে। শত শাসনের মাঝেও সে তার হৃদয়কে সংযত করতে পারে না। বার বার দৃষ্টি চলে যায় ঐশীর সুশ্রী চেহারার দিকে।

স্যারের কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে ঐশী।

নয়ন লজ্জায় দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

তখন ঐশী বলে, স্যার, একটা কথা বলবো?

বলো। নয়ন সায় দেয়।

আসলে আপনি যখন প্রথম আমাকে পড়াতে আসেন তখন থেকেই আপনাকে আমার ভালোলাগতে শুরু করে। সবার মুখে আপনার প্রশংসা শুনতে শুনতে আপনাকে অজান্তেই ভালোবেসে ফেলি। কিন্তু বলার সাহস পাইনি। কেননা আপনি কখনো আমার দিকে তাকাননি। অথচ কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করলাম, হয়তো আপনিও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। তাই আজ বললাম। আপনিও কি আমায় ভালোবাসেন?

হ্যা বাসি। নয়ন নিচু স্বরে ধীরে ধীরে বলে।

তাহলে আমার হাতে হাত রাখুন।

নয়ন কাপা কাপা হাতে ঐশীর বাড়িয়ে দেয়া হাত নিজের হাতে তুলে নেয়।

ভালোবাসার সূচনা হয় সেদিন থেকে। একে অপরের জীবনের সঙ্গে জড়াতে থাকে। কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না। অথচ তারা জানে না তাদের ভালোবাসার শেষ পরিণতি। তারা শুধু বিশুদ্ধ, পবিত্র, স্বচ্ছ ভালোবাসাবাসিতে মগ্ন।

চট্টগ্রাম থেকে

ইন্টারনেট

– এমদাদ উল্লাহ জামিল

বলুন তো, ঠিক এ মুহূর্তে ইন্টারনেটে কোন ধরনের সাইটে মানুষ সবচেয়ে বেশি যাচ্ছে? এর উত্তর খুবই সহজ। ভ্যালেনটাইনস ডে বিষয়ক সাইট। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, খেলাধুলা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে সিটিজেনরা এখন ভিড় করছে ভালোবাসার সাইটগুলোতে।

সাইবার বিশ্বে ভালোবাসা পেয়েছে বিশ্বজনীন রূপ। আপনার প্রিয় মানুষটিকে কি ধরনের ই-কার্ড পাঠাবেন, এদিনে উপহার বা রান্না কি হওয়া উচিত, বাজারে কোন ফুলটি ভালোবাসার উপহার হবে, আপনার প্রেমিক-প্রেমিকা বেছে নেয়ার জন্য পরামর্শ ইত্যাদি সব কিছুই পাওয়া যাবে বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইটে। যায়যায়দিন-এর প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ এসব ইনফরমেটিভ লাভ ওয়েবসাইটগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো আজ।

এক. www.lhmint.org/valentines/storydag.html সাইটটিতে রয়েছে ভ্যালেন্টাইনস ডে, উৎপত্তির মূল ইতিহাস যেটিতে রয়েছে রোমান সাম্রাজ্যের এক ধার্মিক ব্যক্তি সেন্ট ভ্যালেন্টাইন-এর গল্প।

দুই. প্রিয়জনকে কার্ড পাঠাতে কে না পছন্দ করে? ইচ্ছা করলে আপনিও ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে আপনার প্রিয়জনকে গৃটিংস কার্ড পাঠাতে পারেন। নিম্নের সাইটগুলোর সাহায্যে বিনা মূল্যে আপনি আপনার পছন্দ মতো ই-কার্ড পাঠাতে পারেন।

www.e-cards.com
www.deshigreetings.com
www.gogocards.com

তিন. আর যদি কাউকে কবিতার ভাষায় বলতে চান মনের কথা তাহলে আপনার উপযোগী সাইট হচ্ছে - www.electpress.com/loveandromance/index.htm. এখানে রয়েছে ভালোবাসার কবিতা এবং তথ্যের পাহাড় প্রমাণ সংগ্রহ।

চার. ভ্যালেনটাইনস ডে-র একটি খুব আকর্ষণীয় সাইট হচ্ছে www.valentine.com. গোলাপি রঙের এই সাইটটিতে আপনি লাভ লেটার লেখা ও প্রেমে সফল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ (!) দের মতামত পাবেন।

পাচ. ভোজন রসিক প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য রয়েছে সুখবর। www.holidays.net/amore সাইটটিতে রয়েছে ভ্যালেনটাইন ডে স্পেশাল রান্নার রেসিপি।

ছয়. ২০০১ সালের ভালোবাসা দিবসে আত্মপ্রকাশ করেছে ভালোবাসার প্রথম বাংলা সাইট www.bhalobashi.com. রক্তিমাভ ব্যাকগ্রাউন্ডের এই ওয়েবসাইটে রয়েছে বর্তমান টেক বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে চিরন্তন বাংলা প্রেমের মিথষ্ক্রিয়তার ঘোষণা। এ ওয়েবসাইটের উল্লেখযোগ্য বিভাগগুলো হলো - কবিতার মেলা, রোমান্টিক বাংলা ও ইংরেজি গান, প্রতিষ্ঠিত কিছু ভ্যালেনটাইনস ওয়েবসাইট, রোমান্টিক ফিল্ম, প্রিয়জনের উপহার, ভালোবাসার ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

সাত. ভ্যালেনটাইনস ডে-তে যারা শুভ কাজটি সারতে চান তারা পছন্দনীয় পাত্র পাত্রীর খোজে ক্লিক করতে পারেন নিম্নের ওয়েবসাইটটিতে - www.monikabadhon.com.

আট. নতুন বন্ধু এবং প্রেমিক-প্রেমিকাদের খোজ পেতে আগ্রহীরা আজই ঘুরে আসুন এই ওয়েবসাইটটিতে www.love-friendship.com.

চট্টগ্রাম থেকে

জিদ্দি

১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেনটাইনস ডে।

গত বছরও এদিনে একা ছিলাম। একজন অফার করেছিল। তবে প্রেমের নয়, বিয়ের।

তখন আমার ফ্যামিলির কথা ভেবে আঞ্চলিক সমস্যাটাকেই প্রধান বলে মনে হয়েছে। আর এ জন্যই তার প্রপোজালে রাজি হইনি। তাছাড়া তার সম্পর্কে আমি তেমন কিছুই জানি না। কয় ভাইবোন, বাসা-বাড়ি কোথায় এবং পেশায় মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির ম্যানেজার, শুধু এটুকুই জানি। তিনি কেমন, আচার-ব্যবহার কেমন এটা জানা জরুরি।

আমার সঙ্গে তার পরিচয় ফোনে। এ কারণে মুখোমুখি তাকে চিনি না। তবে কথাবার্তা খুব ভালো লাগছে। একদিন ঠিক হলো তার সঙ্গে দেখা করবো।

অপরিচিত একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করবো। ভয় ভয় লাগছে আবার দেখতেও ইচ্ছা করছে। কোনো একভাবে তার সম্পর্কে খোজখবর নিলাম। রিপোর্ট ভালো। খুব ভদ্র, নম্র, শান্ত, মনটা খুব ভালো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দেখতে কেমন?

বললো, অনেক লম্বা। পাচ ফিট দশ ইঞ্চি। গায়ের রং কালো। তবে দেখতে ভালো। তাকে দেখার ইচ্ছাটা আরো বেড়ে গেল।

একদিন সে আমাকে ইনভাইট করলো ইউরো গার্ডেন চায়নিজ রেস্টুরেন্টে।

দেখা হলো, কথা হলো, খাওয়া হলো।

এর কিছুদিন পর সে আমাকে অফার করলো।

আমি দেখতে কেমন জানি না, সে ভালো বলতে পারবে। আমার মনে হয় আমি তার যোগ্য নই। কারণ তার তুলনায় আমার হাইট অনেক কম। মাত্র পাচ ফিট। আমার হাইট নিয়ে ততোটা আফসোস করিনি যতোটা তাকে দেখার পর করছি।

কিন্তু তাকে যে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি তো না করে দিয়েছি। এখন আবার হ্যা বলতে লজ্জা লাগবে না? বেশি ভাবলে প্রেম হয় না।

বেশি বেশি ভেবেই তো এ জীবনে কিছুই হলো না। আর ভাবনা নয়, ভালোবেসেছি তো বেসেছি।

গত বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি তাকে আমার ভালোবাসার কথা জানালাম।

যেহেতু সে চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, তার মধ্যেও মাঝে মধ্যে আমাকে সময় দেয়।

আমার ইচ্ছা করে সারা দিন তার কাছে কাছে থাকি। সারাক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি মরেছি। পড়ালেখা গোল্লায় গেছে। রেজাল্টও খারাপ হলো। যে আমি পড়াশোনার প্রতি এতো মনোযোগী সেই আমি পড়ালেখার প্রতি উদাসীন।

যাহোক, হালকা, গাঢ় অভিমানে প্রায় এক বছর কেটে যাচ্ছে। ফোনে কথা হয়। দেখা হয় কম।

সম্প্রতি কি একটা কারণে রাগ করে ফোন রেখে দিয়েছিলাম।

সে আমাকে বললো, তোমার নাম এখন থেকে *জিদ্দি*। আমি ভেবেছিলাম তোমার কোনো রাগ নেই। এখন দেখছি তোমার অনেক জেদ।

প্রায়ই যে ঘটনাটা বেশি মনে পড়ে সেটা হচ্ছে তার প্রথম স্পর্শের কথা। সে আর আমি সন্ধ্যার পর রিকশায় আসছিলাম। হঠাৎ করে সে আমাকে কিস করলো, জড়িয়ে ধরলো।

মুহূর্তের মধ্যে আমার কি যে হয়ে গেল, কে যেন আমার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে গেল!

সে আমাকে অনেকবার আদর করেছে। কিন্তু প্রথম দিনের স্পর্শের কথা কখনো ভুলবো না। সত্যিই সেটা ছিল অদ্ভুত।

এবারের ভ্যালেনটাইস ডে-তে তার সঙ্গে সময় কাটাতে পারবো এটা ভেবে ভালো লাগছে। এ বছরই আমরা বিয়ের কথা ভাবছি। তাদের বাসা থেকে সমস্যা নেই। আমাদের বাসা থেকে সমস্যা হবে। কি যে করবো তা-ই সারাক্ষণ ভাবি।

তাকে খুব ভালোবাসি। সে আমাকে ভালোবাসে হয়তো আমার চেয়েও বেশি। সে যদি কোনো কারণে আমাকে কষ্ট দেয় তাহলে আমার মনে হয়, আমি মরে যাবো। সাধারণত আমি ইমোশনাল কথা তাকে বলি না। লেখাটা ছাপা হলে তাকে পড়তে দেবো। যা বোঝার বুঝবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

দ্বিতীয় স্বামী

– গুলনাহার

আমি একাধিক সন্তানের মা। আমার স্বামী বর্তমান। তারপরও আমি একজনকে ভালবাসি। আমার নিজ জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। সেও আমাকে তার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সে আমাকে আদর করে *আদুরি* ও *রাঙাবৌ* বলে ডাকে। আমিও তাকে *হৃদয়* নামে ডাকি।

আমার স্বামী যখন অফিসে চলে যায় তখন হৃদয়ের কাছে ফোন করি, গল্প করি। জীবনের সুখ দুঃখগুলো ভাগাভাগি করে নিই। আমি যদি হৃদয়ের সঙ্গে একদিন কথা না বলি বা হৃদয় যদি একদিন আমার সঙ্গে কথা না বলে সেদিন আমার নাওয়া–খাওয়া, ঘুম, সব কিছু হারাম হয়ে যায়।

চোখ বন্ধ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে হৃদয়ের ছবি। আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে হৃদয়। হৃদয়ের সঙ্গে একদিন কথা না বলার অর্থই হচ্ছে আমার জীবন থেকে সুখের একদিন ঝরে যাওয়া। হৃদয় তার সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং তার আচার–ব্যবহার দিয়ে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে হৃদয়কে মনে–প্রাণে লোক চোখের আড়ালে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছি।

আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে হৃদয় বাইরে থেকে এসেই আমাকে খুব কাছে টেনে নেবে। তারপর আলতো করে আমার কপালে একটা চুমু খাবে। এরপর জিজ্ঞাসা করবে আমি কেমন আছি। খেয়েছি কি না। সারা দিন ভালো ছিলাম কিনা। কোনো সমস্যা আছে কি না। এক প্লেটে ভাত নিয়ে আমাকে আদর করে খাইয়ে দেবে, আমার মুখেরটাও খাবে। টিয়া পাখির মতো আমার মুখে মুখে এক লোকমা না খেলে নাকি তার পেট ভরে না। খেয়ে–দেয়ে তৃপ্তি পায় না। তারপর আমি গ্লাসের যেখানটিতে মুখ লাগিয়ে পানি খাবো ঠিক সেখানটিতে মুখ লাগিয়ে হৃদয়ও পানি খাবে। তারপর যখন বের হবে তখন আমার এগালে ওগালে এবং কপালে চুমু খেয়ে বের হবে। আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো দেখলে নিজ হাতে চিরুনি নিয়ে আচড়িয়ে দেবে। বিভিন্ন অকেশনে সে আমাকে গিফট দেবেই দেবে।

তার ছেলেমানুষি, পাগলামি দেখে মাঝে মধ্যে রাগ করি। সে রাগ অন্তরের নয়, মনেরও নয় – মুখের রাগ।

তাতেই তার সুন্দর মুখখানা মলিন হয়ে যায়।

পরে মায়া হয়। কষ্ট পাই। কারণ, আমিও তো তাকে মন–প্রাণ, দেহ উজাড় করে ভালোবাসি। হৃদয় আমাকে যতো ভালোবাসে তারচেয়েও কয়েক হাজারগুণ বেশি ভালোবাসি হৃদয়কে।

তার সংস্পর্শে স্বর্গসুখ পাই। তাকে না দেখে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। সে কথা আমি হৃদয়কে বুঝতে দিই না। আমার শরীর থেকে একটি পশম পড়লেও সে খোজ হৃদয় রাখে। হৃদয় আমাকে তার সম্পদ মনে করে।

তবে আমার স্বামী আমার কোনো খোজ রাখে না। হৃদয় যা আমার জন্য করে তা আমার স্বামী কোনোদিনও করেনি। আমার স্বামী অফিস থেকে এসে লেদার বৃফকেসটা সোফায় ফেলে ডিনার সেরে টিভির সামনে বসবে। গভীর রাত পর্যন্ত ইংরেজি ছবি দেখবে।

তারপর ইচ্ছে হলে আমার কাছে আসবে, উঠবে, করবে, নেমে যাবে। অরগাজমের কোনো পূর্ব প্রস্তুতি তার কাছে নেই। আমি তৃপ্তি পেলাম কি না পেলাম বা আমার কোনো চাওয়া–পাওয়ার হিসাব তার কাছে নেই।

আমার স্বামী স্মার্ট ও হ্যান্ডসাম। ধন–দৌলত, টাকা–পয়সার কোনো কিছুরই অভাব নেই। অভাব শুধু সুন্দর একটি মনের।

পাঠক, হয়তো বলবেন, আমার স্বামীকে আমি ঠকাচ্ছি। মোটেও না। বরং আমার স্বামীই আমাকে ঠকিয়েছে। আমাকে বঞ্চিত করেছে তার প্রেম ভালোবাসা থেকে। একটি নারীর জীবনে অর্থ–সম্পদ, টাকা–পয়সার চেয়ে

তার স্বামীর আদর-স্নেহের, প্রেম-ভালোবাসা পেতে চায় বেশি। এর দাম অনেক। এটাই একটি নারীর কাছে বড় সম্পদ।

তাই তো আমি ভেসে গেছি হৃদয়ের ভালোবাসার জোয়ারে। হৃদয়ের কাছে খুজে পেয়েছি অনাবিল সুখ। আপনারা হয়তো বলবেন, এ আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু ভালোবাসা কি ন্যায়-অন্যায় মানে?

অবশেষে আমি অনুতপ্ত। তবে এ অনুতাপ আমার স্বামী, সন্তান, সংসারের জন্য নয়। অনুতপ্ত হৃদয়ের জন্য। কারণ, হৃদয় অবিবাহিত মেধাবী এক টগবগে তরুণ। তার ভালোবাসার দুর্বলতাকে আশ্রয় করে আমার চাওয়া-পাওয়াকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। এদিকে হৃদয় যে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল করিনি। হৃদয়ের জীবনের যা ক্ষতি হয়েছে তা হয়তো কোনোদিন পূরণ করতে পারবো না। তবে তাকে আমার ভালোবাসা দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

হৃদয়, একটি কথা মনে রেখো, এ পর্যন্ত আমার স্বামী পেয়েছে শুধু দেহটা। আর তুমি পেয়েছো ভালোবাসাসহ দেহ এবং মন প্রাণ উভয়টা। তোমার এ রাঙাবৌ তোমারই আছে, তোমারই থাকবে, তোমার নাম নিয়েই সে মরবে।

এই ভালোবাসা দিবসে সকল স্বামীদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ভালোবাসায়, ভালোবাসায় আপনাদের স্ত্রীদের মন-প্রাণ ভরিয়ে দিন। লোক চোখের আড়ালে আমার মতো আর যাতে কোনো স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে না হয়। টাকা-পয়সা নয়, নারীদের কাছে স্বামীর ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ঠিকানা বিহীন

১৩০৫ দিন খরচে প্রাপ্তি ১৩৮ দিন

– প্রেতাত্মা

ভালোবাসা স্রষ্টার কাছ থেকে পাওয়া এক স্বর্গীয় উপহার। এ উপহার কোনো লটারি বা কুইজের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। সকলেই সে উপহার পেয়ে থাকে। কেউ সে উপহার ধরে রাখতে পারে, কেউ হারায় কেউ বা আবার পাওয়া না পাওয়ার মাঝে ভেসে বেড়ায়। আমিও পেয়েছি। তবে প্রশ্ন আসে, আমি কি তা রাখতে পেরেছি?

আমার উপহারটি ছিল পেতনি।

পেতনিকে ভালোবাসি আমি গত ১৩০৫ দিন ধরে। সেও আমাকে ভালোবাসে প্রায় সব সময়। তবে তাকে ভালোবেসে কাছে পেয়েছি ১৩৮ দিন যা কখনো ফোনে, কখনো চলার পথে, কখনো বা সামনাসামনি। প্রচণ্ড তৃপ্ত ছিলাম প্রাপ্ত উপহারে। তবে ভুলক্রমে মনে হয়, স্রষ্টা আমার যোগ্যতা অনুযায়ী অনেক দামি উপহার দিয়ে ফেলেছে। তবু তো পেয়েছি!

মাঝে মধ্যে অবাক হই, কি যে চায় পেতনি। আর কিই বা দেয়ার আছে আমার! কি বা দিতে পারে একজন প্রেমিক এবং কিই বা চাইতে পারে একজন প্রেমিকা? বুঝতে পারি না আজও।

কখনো আমার জন্য কাদতো, কখনো হাসতো, কখনো দূরে রাখতো, কখনো ভালোবাসতো। কাছে পাইনি গত তিনটি ভালোবাসা দিবসে এবং পাবো না বোধহয় এবারও। তাই...।

ভালোবাসি যারে তার থেকে কি দূরে যেতে পারি। আজ ভালোবাসার দিনে জানিয়ে দিলাম তোমায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা আজ তোমার তরে।

সাতমাথা, বগুড়া থেকে

ভাবী

– মীর জাফর আলী

আমার বয়স যখন তেরো তখন ঢাকা শহরে বড় ভাইয়ের বাসায় গেলাম ভালো স্কুলে লেখাপড়া করার জন্য। গণ্ডগ্রামের ছেলে রাজধানীর সেরা স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার বৈতরণী নির্বিঘ্নে পার হলাম।

বড়ভাই উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। ভাবী ততোধিক উচু পদের আমলার মেয়ে। সুন্দরী, সুশিক্ষিতা। আল্লাহ কাউকে যখন কিছু দিতে চায় তখন অকৃপণভাবেই দেয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ভাবীকে আল্লাহ শুধু রূপ, জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তার জিভ এবং অন্তরে এমন ঝাঝ দিয়েছেন যা দিয়ে অনায়াসে একটি মানুষের হৃদয়কে ভস্মীভূত করা যায়।

কিছুদিন যেতেই ভাবীর নির্মম আচরণে হাপিয়ে উঠলাম। কিন্তু হাপ ছাড়ার জায়গাও আমার ছিল না। যখনই গ্রামের বাড়ির কথা মনে হতো তখন চোখের সামনে সমস্যা জর্জরিত একটি ঘর ভেসে উঠতো যা থেকে মুক্তি পেতে চাইতাম।

এতো কষ্টের মাঝেও আমার সান্ত্বনা ছিল, আমার প্রতি বড় ভাইয়ের প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা। অফিস শেষে তিনি যখন বাসায় ফিরতেন তখন তার কুণ্ঠিত আচরণ, আমার প্রতি করুণা বিগলিত চাহনি দেখেই সেই ছেলেবেলায়ও বুঝতে পারতাম স্ত্রীর আচরণে তিনি লজ্জিত। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান মানুষ। আমার জন্য তাদের দাম্পত্য জীবনে তিলমাত্র অশান্তি সৃষ্টি হোক তা তিনি চাননি। তাই আমার প্রতি তার যেমন গোপন ভালোবাসা ছিল তেমনি তার স্ত্রীর নির্মম আচরণকেও তিনি প্রশ্রয় দিতেন।

এই কষ্টের ভেতর দিয়ে চার বছর কাটালাম। এক সময় সেখানে আমার থাকা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠলো। কাউকে কিছু না বলে চট্টগ্রামের ট্রেনে চেপে বসলাম। গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর বড় ভাইয়ের আর্থিক সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যে চলে গেলাম।

দশ বছর মধ্যপ্রাচ্যে ছিলাম। পেট্রডলার সঞ্চয় করার জন্য দিন–রাত পরিশ্রম করেছি। দেশে এসে ব্যবসা শুরু করলাম। ব্যবসায়ে দিন দিন উন্নতি হতে লাগলো। গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে আমার মেধা এবং অর্থ অকাতরে খরচ করতে লাগলাম। সমাজে আমার প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

এরই মাঝে আমার পিঠাপিঠি বড় ভাইয়ের জন্য পাত্রী খোজা আরম্ভ হলো। আমাদের পুরনো আত্মীয়ের এক অনিন্দ্য সুন্দরী মেয়েকে পাত্রী নির্বাচন করা হলো। যথাসময়ে শুভ কাজ সম্পন্ন হলো।

আমরা সাত ভাই, তিন বোনের বিশাল পরিবার। কিন্তু বাড়িতে মানুষ বলতে তেমন নেই। বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইদের মধ্যে সবাই বৌ–বাচ্চা নিয়ে চাকরি এবং ব্যবসা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে বাস করেন। বাড়িতে আমি, আমার বৃদ্ধা মা এবং সদ্য বিয়ে করা আমার ভাই–ভাবী।

ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই খুশি ছিলাম না। ঘর পোড়া গরু যেমন সিদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায় তেমনি আমার কাছে ভাবী নামের শব্দটি ছিল এক মূর্তিমান আতংক।

কিছুদিন যেতেই আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আমার প্রতি নতুন ভাবীর সহৃদয় আচরণ। কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম, তার আন্তরিকতায় কোনো কপটতা নেই। তিনি সত্যিই আমাকে স্নেহ করেন। আমার মা এবং কাজের মেয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন আমার প্রিয় খাবারের তালিকা। ব্যবসায়ের কাজে ছোটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই নিজ হাতে চা নিয়ে আমার সামনে হাজির হতেন। চা যে আমার প্রিয় তা আমার পরিচিত সবাই জানে।

যে ভালোবাসার জন্য আমার মন দিনের পর দিন পিপাসায় কাতর ছিল, একজন নারীর অপরিমেয় ভালোবাসায় সেই মন কানায় কানায় ভরে গেল। এক যুগ আগে বড় ভাবীর কাছে যে লাঞ্ছনা, অবহেলা

পেয়েছিলাম, আল্লাহ যেন আজ এই ভাবীকে দিয়ে তারই সুদে-আসলে পুষিয়ে দিচ্ছে। বন্যার তোড় যেমন খড়কুটোকে প্রবল বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ভাবীর নিষ্কলুষ ভালোবাসা তেমনি আমার অতীতের সব গ্লানি, বেদনা এবং ক্ষোভকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আমার ভাই কিছুদিন থেকে কঠোর ব্যবসা শুরু করেছেন। ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই তাকে রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি থাকতে হতো। এখন আমি, আমার মা, ভাবী এবং কাজের মেয়েটাই শুধু বাড়িতে। জীবনটা আমার কাছে খুব উপভোগ্য হয়ে উঠলো। ভাবীর কোল জুড়ে এক সোনামণির আগমনে আমাদের সুখের সীমা রইলো না। শত ব্যস্ততার মাঝেও সেই ছোট্ট ছেলের কচি মুখটি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।

সৌভাগ্য আমার ওপর হঠাৎ বিমুখ হলো। ব্যবসায়ে চরম মন্দা যেতে লাগলো। মাসের পর মাস লোকসান দিতে দিতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করলাম। রাত দিন খাটা-খাটুনি করেও পতন ঠেকাতে পারলাম না।

মানসিক এবং শারীরিকভাবে ভেঙে পড়তে লাগলাম। আস্তে আস্তে বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা কমতে থাকলো। ঘরে-বাইরে আমাকে নিয়ে উপহাস শুরু হলো। পাওনাদারদের তাগাদায় আমার চোখের ঘুম চলে গেল।

এই দুঃসময়ে যখন চারদিকে অন্ধকার দেখতাম তখন ভাবী এসে আমার পাশে বসতেন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। আমাকে বোঝাতেন, ভাইয়া, আপনার ব্যবসা আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ আপনাকে আবারও সম্পদশালী করবে।

ভাবীর কথাগুলো বিশ্বাস করতে খুব মন চাইতো।

যাদের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ ছিলাম তারা সকলে একে একে আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের তালিকায় ভুলক্রমে আমার নাম বাদ পড়ে যায়। এই ভুলের জন্য এরা দুঃখিত হয় না, অনুতপ্ত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

আমার বৃদ্ধা মা নামাজ পড়ে আমার জন্য দোয়া করেন। আমার আদরের ছোট্ট ভাতিজা, আমার ব্যথিত গম্ভীর মুখ দেখে খেলা থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবাই যখন আমাকে নিজের ত্রিসীমানার বাইরে রাখতে চাইছিল তখন ভাবী তার স্নেহের চাদরে আমাকে ঢেকে রাখার জন্য প্রাণপাত করতে লাগলেন, যেন বাইরের পৃথিবীর মানুষদের অবহেলা, উপেক্ষা, বিদ্রূপ আমার শরীরে বিন্দুমাত্র আচ লাগাতে না পারে। আমার খাওয়া-পরার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হলেন। ডিম এবং হরলিক্স বানিয়ে এনে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এতো দুশ্চিন্তা করলে অসুস্থ হয়ে পড়বো এই বলে আমাকে তিনি বকতেন। সপ্তাহ শেষে ভাই বাড়ি এলে গম্ভীর মুখে বসে থাকেন। আমাকে দেখলে তার গাম্ভীর্য আরো বেড়ে যায়।

সে রাতে ভাবী হরলিক্স নিয়ে আমার ঘরে এলেন।

আমি খেতে চাচ্ছিলাম না।

কৃত্রিম রাগ করে বললেন, এভাবে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে মরে যাবেন নাকি?

হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, ভাই পাশের ঘর থেকে চেচিয়ে উঠলেন, ওকি কচি খোকা নাকি যে, এতো আহ্লাদ করে খাওয়াতে হবে?

চমকে উঠে ভাবীর দিকে তাকালাম। ভাবী আমার দিকে একবার তাকিয়েই চলে গেলেন।

ভাই পরদিন ভাবী এবং বাচ্চাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন, ভাবী সেখানে কিছুদিন থাকবেন।

ভাবী চলে যাবার পর একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। যেদিকে তাকাই, ফাকা মনে হতে লাগলো। ভাবী এবং বাচ্চাটির কথা সারাক্ষণ মনে পড়ে।

দশ দিন পর ভাবীকে দেখতে গেলাম। রোজার দিন। ইফতার শেষে টিভি দেখছিলাম। ভাবীর আম্মা আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম, খালাম্মা, ভাবী এবং ভাবীর ছোট বোন বসে আছেন। সবার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। খালাম্মা যা বললেন তার সারাংশ হলো, আমি এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য না করে ঘরে বসে তাদের জামাইয়ের বোঝা হয়ে থাকলে কিভাবে চলবে? তাদেরও তো সংসার আছে।

লজ্জায় অভিভূত হয়ে ভাবীর দিকে তাকালাম।

জীবনে যা কোনোদিন কল্পনা করিনি তাই বাস্তবে দেখলাম। ভাবী কঠিন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। খালাম্মা যে কথাগুলো আমাকে বললেন তাই ভাবীর মুখে প্রতিফলিত হচ্ছে।

মনে হলো আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

চড় খাওয়া শিশুর মতো ভাবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মোঘলেরহাট, চট্টগ্রাম থেকে

মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অফ লাভ

– ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক

লাভ অ্যান্ড ম্যারেজ, লাভ অ্যান্ড ম্যারেজ : দে গো টুগেদার, লাইক হর্স অ্যান্ড ক্যারেজ (They go together, like horse and carriage)..., হর্স অ্যান্ড ক্যারেজ...। অর্থাৎ প্রেম আর বিয়ে চলে ঘোড়া এবং গাড়ির মতোই।

কি সুন্দর গানটি ফ্র্যাংক সিনাট্রা গেয়েছেন। লাভ আর ম্যারেজ এ দুটি জিনিসের মধ্যে সম্পর্কটা এতোই মৌলিক, এ সত্যটি যে কোনো সাধারণ ভদ্র মানুষকে (জেন্ট্) জিজ্ঞাসা করলেও জানতে পারার কথা। এ গানটি অবশ্য সিনাট্রা-র একটি মুভি থেকে। বাস্তব জীবনে তার এতো ভালোবাসা শেয়ার করার ছিল যে, তিনি চার চারটি বিয়ে করেছিলেন। সিনাট্রা ছিলেন একজন হলিউড সুপারস্টার। তার মতো হর্স এবং ক্যারেজ-এর সম্মিলন অনেক সাধারণ মানুষের জীবনে যে হবে না সেটাই স্বাভাবিক। ফ্র্যাংক সিনাট্রা বলতেন, এর বিপরীতটার আশা করাই অনুচিত।

সমসাময়িক সময়ে যেখানে কোনো কিছুই আর পবিত্র বা অলংঘনীয় (Sacred) গণ্য করা হয় না। সেখানে পরিবারের ধারণাটাও সেকেলে ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে তা বোঝাটা দুষ্কর নয়। প্রেম-ভালোবাসা মূলত আবেগ, অনুভূতির বিষয়। সেক্স বা যৌনতা মূলত দৈহিক ক্ষুধার সঙ্গে সম্পৃক্ত। দুটো বিষয়ের মধ্যে অবশ্য ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে।

এ বিষয়টা বুঝতে কারো খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যেসব শিশুরা এ দুনিয়ায় আসে ভালোবাসা এবং পবিত্র কোনো বন্ধনের ভিত্তিতে, তাদের জন্য সম্ভাবনাটা বেশি। তাদের জীবন ও অস্তিত্বের বাস্তবতাটা নিয়ে তারা ভাববে, বুঝবে এবং সম্মানের সঙ্গে দেখবে মমতা ও পবিত্রতার প্রেক্ষাপটেই। আর যাদের আগমন ভালোবাসা ও বিয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছাড়াই নিছক যৌনতা বা কামনা-বাসনার নাগরদোলায় চড়ে তাদের জীবন এবং অস্তিত্বের উপলব্ধি হবে অনুরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে।

দেহের যৌন কামনা ক্ষণিকের। দৈহিক কামনার জোয়ার আসতে বেশি সময় লাগে না। প্রমত্ত পর্যায়ে পৌছে যায় অতি সহজেই। তারপর তা অনিবার্যভাবেই যায় নিভে। এই উদগ্র কামনার পুলকিত মুহূর্তগুলোতে স্থায়িত্বের কোনো অর্থ বা চেতনা থাকে না। কিন্তু প্রেম ভালোবাসার স্থায়ী অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। প্রাকৃতিক

জগতে পশু-পাখিদের মাঝে দেখা যায় যে, তাদের যৌনতারও সাধারণত দুটো দিক রয়েছে। তারাও ঘর বাধে এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। মানব প্রজাতির জন্যও তা অনুরূপভাবে প্রকৃতি সম্মত।

মার্ক টোয়েইন-এর তথাকথিত সেকেলে মনোভাবের পরিচয় মেলে তার এ উদ্ধৃতিতে : *লাভ সিমস দি সুইফটেস্ট, বাট ইট ইজ দি স্লোয়েস্ট অফ অল গ্রোথস। নো ম্যান অর ওম্যান রিয়ালি নোজ হোয়াট পারফেক্ট লাভ ইজ, আনটিল দে হ্যাভ বিন ম্যারেড এ কোয়ার্টার অফ এ সেঞ্চুরি* (আপাতদৃষ্টিতে ভালোবাসা মনে হয় সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভালোবাসা সবচেয়ে ধীরে বাড়ে। কোনো পুরুষ অথবা নারী সিকি শতাব্দী দাম্পত্য জীবন না কাটানো পর্যন্ত জানেনই না সত্যিকার ভালোবাসা কি? – মার্ক টোয়েইনস নোট বুক)।

অবশ্য কখনো কখনো তার সুর ছিল ভিন্ন। মানব প্রজাতির প্রজননে নীতি বিগর্হিত (immoral) কিছু নেই। তা কোনো আনুষ্ঠানিকতাসহ হোক বা না হোক (মার্ক টোয়েইন, এ বায়োগ্রাফি)।

আধুনিক সমাজে আমরা যেখানে মুক্ত বিহঙ্গের মতো হওয়ার কল্পনার রঙিন ফানুসে উড়তে চাই সেখানে এসব নিছক সনাতনী কথা। এসবের মধ্যে সেকেলে ধারণাটাও রয়ে গেছে যে, এক বিয়ে-বন্ধনের জন্য আরেকটি বন্ধন প্রয়োজন। তা হচ্ছে বিয়ে ও প্রেম-প্রীতির মধ্যেও একটি সংযোগ থাকা বা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যৌন মুক্তি আন্দোলন উত্তর পর্যায়ে আমাদের উগ্র আধুনিক মনমানসিকতার কাছে এসব টোয়েইনি জটিলতার অবকাশ কোথায়?

মেকিং লাভ : অর্থ পরিভাষার রূপান্তর

সামগ্রিকভাবে বিয়ের ধারণার ক্ষেত্রে র‍্যাডিকাল পরিবর্তন এসেছে। এখনো বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছে, বিয়ে অর্থ হচ্ছে একজন পুরুষ ও নারীর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মিলন। কিছু কিছু পুরনো ডিকশনারিতে (যেমন The Advanced Learner's Dictionary of Current English-এর ১৯৭৩ সংস্করণে) উপরিল্লিখিত একটি অর্থই রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণ বিয়ের অর্থ যে সবার কাছে এক ও অভিন্ন তা আর নাও হতে পারে। সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় যখন কোনো বিয়ের কথা শুনলে অথবা নিমন্ত্রণ পেলে বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে হবে, এটা কি ভিন্ন লিঙ্গ (Hetero-sex) বিয়ে না, অভিন্ন লিঙ্গ (Same Sex) বিয়ে।

কে জানে ভবিষ্যতে হয়তো মানুষ ও পশু-পাখিরও বিয়ে হবে এবং তার আইনানুগ ও সামাজিক স্বীকৃতির দাবি উঠবে! বস্তুত বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের লেজ বিশিষ্ট পূর্ব পুরুষ আত্মীয়েরা এখনো আছে এবং গাছ থেকে গাছে সদানন্দে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। নৈতিকভাবে ঠিক বা ভুল যেহেতু আপেক্ষিক হয়ে যাচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা রয়েছে আপন আপন সংজ্ঞা বেছে বা খুজে নেয়ার। তাই নয় কি? তাহলে এ নিয়ে এতো হই চই হাঙ্গামার কি আছে?

বিষয়টা বোঝার জন্য প্রথমে যেসব পরিবর্তন ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং যা আমাদের চোখের সামনেই হয়ে চলেছে তার ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর কিছুটা আলোকপাত করা যাক। গত অর্ধ শতাব্দীর র‍্যাডিকাল সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পেছনে কাজ করেছে যৌনতার ব্যাপারে পশ্চিমি। যেমন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী টিনা টার্নার-এর কথায় : *প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে এর (অর্থাৎ যৌনতার) সম্পর্ক কি?*

প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা ও সেক্স ক্রমে সমার্থক হয়ে গেছে। যেমনটি এই সময়ের অনেক পপ সঙ্গীতে পাওয়া যায় যৌনতার অর্থে প্রেম-ভালোবাসা (Love) শব্দের ব্যবহার।

সঙ্গমের অনেক ইংরেজি শব্দ আছে। বর্তমান যুগে সঙ্গমের একটি ইংরেজি হচ্ছে মেক লাভ (Make love)। অতীতে প্রেম ভালোবাসা হতো বা ঘটতো (Love used to happen)। মানুষ প্রেম ভালোবাসা বানাতো না (Make love) যেমন করে গাড়ি, বাড়ি অথবা সম্পদ বানানো হয়। এক শতাব্দীরও বেশি আগে *মেক লাভ* বাক্যাংশের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে যৌনতার সমার্থক হিসেবে নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শেক্সপিয়ার ম্যাকবেথ–এ খুনিদের বলেন, *অ্যান্ড দেন্স ইট ইজ দ্যাট আই টু ইয়োর অ্যাসিস্টান্স, ডু আই মেক লাভ।* এই মেক লাভ বাক্যাংশ আরো অনেক প্রখ্যাত লেখক ব্যবহার করেছেন। জন ড্রাইডেন, হেনরি ফিল্ডিং, জেইন অস্টেন, টমাস হার্ডি, হেনরি জেমস, ডি এইচ লরেন্স প্রমুখ।

তবে বর্তমান যুগের আগে এই বাক্যাংশটা মোটামুটি বোঝাতো অনেকটা এ রকম : কারো বাসনার ঘোষণা বা প্রকাশ। এর সঙ্গে যৌনতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই সমারসেট মম–এর *অফ হিউম্যান বন্ডেজ* উপন্যাসে এই সংলাপ দেখা যায়, *ডিড হি মেক লাভ টু ইউ? হি আস্কড। দি ওয়ার্ডস সিমড টু স্টিক ফানিলি ইন হিজ থ্রোট, বাট হি আস্কড দেম নেভারদিলেস। হি লাইকড মিস উইল্কিনসন ভেরি মাচ, অ্যান্ড ওয়াজ থৃল্ড বাই হার কনভারসেশন, বাট কুড নট ইমাজিন এনি ওয়ান মেকিং লাভ টু হার।*

হোয়াট এ কোয়েশ্চেন। শি ক্রাইড। পুওর গাই, হি মেড লাভ টু এভরি ওম্যান হি মেট। ইট ওয়াজ এ হ্যাবিট দ্যাট হি কুড নট ব্রেক হিমসেলফ অফ।

যারা অবহিত নন যে, এক সময় এ বাক্যাংশের ভিন্ন অর্থ ছিল তাদের জন্য এ ধরনের সংলাপ অনভিপ্রেত রস আস্বাদনের খোরাক হতে পারে। মার্টিন সেন্ট–এর এ লেভেল শিক্ষার্থীদের ক্লাসে হাসাহাসি শুরু হয় যখন জেইন অস্টেনের *এমা* উপন্যাসে নিম্নোক্ত অংশ আসে :

...বাট স্কেয়ার্সলি হ্যাড শি বিগান, স্কেয়ার্সলি হ্যাড দে প্যাসড দি সুইপ গেট অ্যান্ড জয়েন্ড দি আদার ক্যারেজ, দ্যান শি ফাউন্ড হার সাবজেক্ট কাট আপ হার হ্যান্ড সিজড, হার অ্যাটেনশন ডিমান্ডেড অ্যান্ড মি. এল্টন অ্যাকচুয়ালি মেকিং ভায়োলেন্ট লাভ টু হার...।

ক্লাসটি বেশ মজা পেল ম্যানসফিল্ড পার্ক–এ ফ্যানি–র কানে যখন এডমন্ড–এর বীর্যপাতের গল্পটি শুনলো। কিন্তু সেটা আরেক গল্প। এসব শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে তখন যৌনতার কোনো সংযোগ ছিল না।

আসলে যৌনতার সমার্থক হিসেবে মেক লাভ–এর প্রচলনটা মাত্র গত কয়েক যুগে শুরু হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতো এর সূচনা ৬০–এর দশকে আমেরিকায় যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে যখন স্লোগান দেয়া হতো *মেক লাভ, নট ওয়ার* (Make love, not war) তখন থেকে। পিটার ফৃউয়ার–এর মিসেস গ্রুন্ডি স্টাডিজ ইন ইংলিশ পোয়েট্রি বইতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অযৌন অর্থে ব্যবহৃত হতো শুধু সে অর্থটাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রেড ভ্যালেরিয়ান প্রাক বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন গ্রন্থের একটি CD-Rom সংকলন–এ সন্ধান করে পায়, সে ষাটেরও বেশি গ্রন্থকারের প্রত্যেকেই মেকিং লাভ–এর সাবেক অর্থেই ব্যবহার করেছে। যার সঙ্গে যৌনতার কোনো সংযোগ নেই। ১৯১৩ সালে ডিএইচ লরেনস তার বই *সনস অ্যান্ড লাভার্স* (Sons and Lovers)–এ এই শব্দ দুটিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোনো যৌনতার ধারণার বা ইঙ্গিত ছাড়াই। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাবলী ভ্যালেরিয়ান–এর এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

যৌন বিপ্লব : বিয়ের শিকল থেকে প্রেম ভালোবাসার মুক্তি

যৌন বিপ্লবের একটি অন্যতম ফল ভালোবাসা ও বিয়ের সনাতন বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা। যারা সত্যিই বিশ্বাস করে যে, ভালোবাসা ও বিয়ের মধ্যে নৈতিক, মনস্তাত্বিক বা সামাজিক যোগসূত্র নেই, ভালোবাসা এবং বিয়ের

পরিবর্তে ভালোবাসা ও যৌনতার মিলনসূত্র গাথায় তাদের বিরাট এক সাফল্য রয়েছে। এর জন্য যে মূল্যই দিতে হোক, তাদের কাছে এটা অবশ্যই মূল্যবান ছিল।

কিন্তু বিশেষ কি মূল্য দিতে হয়েছে? ক্রমবর্ধমান তালাকের হার, দাম্পত্য অসততা, বিপর্যস্ত পরিবার প্রতিষ্ঠান, ব্যাপক কৈশোর প্রেগনান্সি, ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক বন্ধন, ব্যাপক যৌন অসদাচার, বিরাট সংখ্যক অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, চাওয়া মাত্র গর্ভপাত ইত্যাদি। যারা বিশ্বাস করে যে, ভালোবাসা ও বিয়ের বন্ধন প্রকৃতি এবং নৈতিকতার দ্বৈত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের অনেকের কাছেই এটা মূল্য হিসেবে অনেক বেশি ও অগ্রহণযোগ্য। যারা এ ধরনের জীবন বোধের সঙ্গে একমত নয়, তারা নৈতিকতার সংজ্ঞায়নে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অজুহাত দেখায়।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা ক্রমাগতভাবেই এগিয়ে চলেছি রশি–র (Corded) জগৎ থেকে রশিবিহীন (Cordless) জগতে। আরো একটি অর্থে আমরা কর্ডলেস হয়ে যাচ্ছি। আমরা সবাই জানি, নবজাতকেরা জন্মলগ্নে নাড়ির মাধ্যমে মাতৃগর্ভের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই কর্ড কেটে ছিন্ন করার মাধ্যমেই মানুষ হিসেবে নবজাতকের যাত্রার শুরু হয়। এই কর্ড ছিন্ন করে ফেলার অর্থ এ নয় যে, আবেগ অথবা সামাজিক দিক থেকে সেই কর্ডকে আমরা ভুলে যাই যা কয়েকদিনের মধ্যে শুকিয়ে গিয়ে রেখে যায় শুধু সেই সংযোগের চিহ্ন। এটা এক ধরনের মিষ্টিক, স্বর্গীয় বা মরমী সংযোগ যা নিছক দৈহিক নয়। এটা এক বিশেষ বন্ধনের পরিচায়ক। অনেকের মতেই যার এক পবিত্র দিক রয়েছে, সন্তান ও সেই গর্ভ যাতে সন্তানের জন্ম উভয়ের মধ্যে সংযোগ হিসেবে।

তাই যারা এই জীবনকে দেখে উভজাগতিক বা দুই জাহানের লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে এবং পরিবার কেন্দ্রিক রক্তের সম্পর্ককে পবিত্র হিসেবে দেখে তাদের কাছে শিশু ও মাতৃগর্ভ সংযুক্তকারী কর্ডটি আরো অনেক দূর প্রসারিত কোনো আরেক জগৎ থেকে ঝুলে থাকা কর্ডের অংশ হিসেবে যা আমরা দেখতে পাই না। সম্ভবত চোখ বুজে আমাদের হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখা ছাড়া। সমসাময়িক উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক কর্ডলেস সমাজে আমরা আরেক ধরনের কর্ডলেস সামাজিক পরিবেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। এখন বিয়ের কোনো বন্ধন ছাড়াই মানুষ এক সঙ্গে থাকতে পারে, এমনকি সন্তানেরও জন্ম দিতে পারে।

ঐতিহ্যগত পেরেন্টহুডের মতোই সিংগল পেরেন্টহুড বহুল প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। যৌন বিপ্লব উত্তর যুগে অনেকেই মনে করে, তারা যখন (যেমন করে) খুশি গর্ভধারণ করতে পারে এবং ইচ্ছামতো যখন ও যেমন করে খুশি গর্ভপাতও করতে পারে। কতো সহজে অনেকে বিনা দ্বিধায়, সন্তান–সন্ততি ও তাদের জীবনের কথা তুচ্ছ করে তালাকের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের ওপর তালা লাগিয়ে দেয়। এতে কি তাহলে খুব বিস্মিত হওয়ার থাকে যে, মাতা–পিতারা যেমন সহজভাবে তাদের সন্তান–সন্ততিকে ডে–কেয়ার (Day-care) সেন্টারে পাঠায়, তারই ন্যায্য বদলা হিসেবে বৃদ্ধ পিতা–মাতাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় নার্সিং হোমে?

পরিবার ও ঘর হওয়ার কথা নিরাপত্তা এবং আরামের আশ্রয়। বিশেষ করে মায়ের কোল। কিন্তু আধুনিক কর্ডলেস সমাজে তাতেও দুর্বলতা এসেছে। নবজাতক শিশুকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়ার মতো ঘটনা আর দুর্লভ কিছু নয়। সুসান স্মিথ (সাউথ ক্যারোলাইনা ইউএসএ)–এর মতো এমন মাতাও এখন দুর্লভ নয় যারা নিজের হাতেই তাদের সন্তানদের জীবন নেয়। পরিবার, প্রেম, বিয়ে, মাতা–সন্তান সম্পর্ক কোনো কিছুই আর পবিত্র বা অলংঘনীয় বলে মনে হয় না। মানুষ যখন তাদের কামনা–বাসনা সব কিছুই কোনো অর্থপূর্ণ ও স্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তি ছাড়াই সম্ভব এবং গ্রহণযোগ্য মনে করে তখন এসব আনুষ্ঠানিক ও সনাতনী বন্ধনী শিকল–এর প্রয়োজন কি?

অবশ্যই এ প্রসঙ্গে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যেসব সমাজে বিয়ে এতো পবিত্র, যে ভালোবাসা রোমান্সের সঙ্গে তার কোনো সংযোগ নেই সেখানে প্রায়ই নারীকে নিছক প্রজননের মেশিন ও তত্ত্বাবধায়কে

পরিণত করা হয়েছে। আর তারই বিপরীত মেরুতে রয়েছে আধুনিক কর্ডলেস সমাজ যেখানে ভালোবাসা ও যৌনতার সঙ্গে বিয়ে-শাদির মতো সনাতনী কোনো কিছুর সংযোগ নেই। ড. কার্ল বাওম্যান বলেছেন, লাভ ইজ অ্যান অবসেসিভ ডেলিউশন দ্যাট ইজ কিওর্ড বাই ম্যারেজ। তবে আধুনিক সমাজ যেন বলতে চাইছে, ম্যারেজ ইজ অ্যান অবসেসিভ ডেলিউশন দ্যাট ইজ কিওর্ড বাই লাভ, কর্ডলেস লাভ অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক।

হাওয়া বইছে যৌনতার পক্ষে

যাহোক, এটা মনে হয় অনস্বীকার্য যে, হাওয়া ভালোবাসার পক্ষে বইছে না, বইছে যৌনতার পক্ষে। বিয়েকে যেমনটা আমরা জানি সে রকম বিয়ের পক্ষে নয়, নিছক সম্পর্ক বন্ধনের পক্ষে। অনেকের জন্যই প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা আর হচ্ছে না (Happening)। আমরা ভালোবাসা বানাচ্ছি (Making love)। যেমন আরো কতো কিছু আমরা বানাই। কার, সোফা অথবা ডিজপোজেবল ডায়পার। আমরা এখন ভালোবাসা বানাই (মেক লাভ)। বিস্মিত হওয়ার কি আছে যে, নিছক যৌনতার পরিবর্তে ভালোবাসা যেখানে বিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কর্ডলেস সমাজের প্রভাবে ভালোবাসা এখন হাওয়ার সঙ্গে গায়েব (Gone With the Wind-গন উইথ দি উইন্ড)। মার্গারেট মিচেল-এর জনপ্রিয় উপন্যাস গন উইথ দি উইন্ড-এর মুভি রূপ হয় ১৯৩৯ সালে। মুভিতে অভিনয় করেন ক্লার্ক গেবল ও ভিভিয়ান লি। এই মুভির শেষের দিকে ক্যাপটেন বাটলার তার হ্যাটটি মাথায় দিয়ে, স্টিকটি হাতে নিয়ে তার অনুতপ্ত, ক্রন্দনরতা অবিশ্বস্ত স্ত্রী ও ভালোবাসাকে পেছনে ফেলে যাবার আগে বলেন, *ফ্র্যাংকলি মাই ডিয়ার, আই ডোন্ট গিভ এ ড্যাম!* (সত্যি কথা বলতে কি প্রিয়তমা, এসবে আমার কিছুই আসে যায় না!)

মনে হচ্ছে মেকিং লাভ আধুনিক অর্থে তার আনমেকিংয়ের পথ প্রশস্ত করে চলেছে।

আইওয়া, আমেরিকা থেকে

farooqm@globalwebpost.com

এই প্রবন্ধ লিখতে প্রাসঙ্গিক গবেষণায় রেড ভ্যালেরিয়ান, ইংরেজির সাবেক শিক্ষক এবং মার্টিন স্টেন্ট সহায়তা করেছেন। তাদের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ ইন্টারনেটের সূত্রে।

বাজিমাৎ

- সাহেদ হুসাইন

বাজি ধরেছি বন্ধুদের সঙ্গে। পাচশ টাকার বাজি! টাকার অংকটা বেশি না হলেও আমার কাছে অনেক। লেখাপড়ার খরচ বাবদ বাড়ি থেকে প্রাপ্ত টাকার এক-তৃতীয়াংশ বাজিতে হারলে মেস ভাড়া বাকি পড়বে, খাবারের বিল দিতে না পারলে মেসে মিল বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য এ কথাটা আগেই চিন্তা করা উচিত। ছিল কিন্তু কোনো কিছুই আগে ভাবি না। ঝোকের মাথায় করে বসি। পরে এ নিয়ে অনুশোচনায় ভুগতে হয়।

বাজিতে বরাবরই হেরে যাই তাই। বাজি ধরলে বন্ধুরা ভীষণ খুশি হয়। এবারেও জেতার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কারণ, বাজির বিষয়ে অভিজ্ঞতার ঝুড়ি একেবারে শূন্য।

বাজি ধরার বাতিকটা ছেলেবেলা থেকেই আমার মাঝে মিশে আছে। ছেলেবেলায় কতো বাজি ধরেছি। চৈত্রের খা খা দুপুরে *কালনি* নদীর ঘোলা পানিতে গোসল করতে যেতাম আমরা এক দঙ্গল ছেলে। রাখাল ছেলেরা তখন গরুর পাল নিয়ে নদীর ঘাটে যেতো ধোয়ানোর জন্য। আমরা তখন বাজি ধরতাম, গরুর লেজ ধরে সাতরিয়ে পার হতাম নদী।

ধলের মেলায় সার্কাস আসবে কি আসবে না এ নিয়েও বাজি ধরেছি কতো। আষাঢ়ে যখন চারদিকে থৈ থৈ করতো পানি তখন নাউ আর বৈঠা নিয়ে নেমে যেতাম নাউ দৌড়ানোর জন্য। গাছের ঝুনা নারকেল চুরি করে বাজি ধরতাম।

কথায় কথায় বাজি ধরে অভ্যাস এতোই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত দারোগার সঙ্গে হাতাহাতি। ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি।

তখন আম কাঠালের পুরো মরসুম। স্কুলের আঙ্গিনার আম গাছটাতে ঝুলছে লাল টকটকে অসংখ্য পাকা আম। দেখলেই জিভে পানি আসে। কিন্তু মৌমাছির বাসার দিকে চোখ পড়লেই জিভের পানি শুকিয়ে যায়। কারো সাহসে কুলায় না একটা আম পেড়ে খেতে, আমারও।

সহপাঠী ছেলেগুলো এমন জেদ তুললো যে শেষ পর্যন্ত ধরলাম বাজি। কোনো রকমে মৌচাকটা ভাঙতে পারলে পুরস্কার! *এক.* আমাকে কাধে নিয়ে গ্রাম চক্কর দেবে ওরা। *দুই.* সবাইকে প্যান্ট খুলে বাড়ি যেতে হবে। আর হারলে আমার শাস্তি দ্বিতীয়টি। কারণ প্রথমটি পালন করা সম্ভব হবে না। একা আমি কতোজনকে বহন করবো।

ওরা রাজি হয়। আমিও। এবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পালা। স্কুলের সামনের বাগানের বেড়া থেকে লম্বা একটা খুটি উপড়িয়ে এনে এক মাথা দিয়ে যেই না ধাক্কা দিয়েছি মৌচাকে অমনি ঝাকে ঝাকে মৌমাছি এসে হুল ফুটিয়ে দিল সারা গায়ে। সেদিন হেরে গেলেও ওরা আমাকে কাধে নিয়েছিল তবে গ্রাম চক্কর দিতে নয়, সোজা হাসপাতালে।

সে কি যন্ত্রণা! পুরো এক মাস লেগেছিল ক্ষত শুকাতে। দাগগুলো এখনো মোছেনি। তাকালে এখনো শরীর শিউরে ওঠে।

এরপরেও অনেকবার বাজি ধরেছি। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো মনে মনে। মনে মনে বাজি ধরার একটা মজা আছে। জিতলে পুরস্কার, হারলে শাস্তি নিজেই নিজেকে দেয়া। এই বাজিতে জেতার একটা কৌশল আছে। মনে মনে বাজি ধরে চেষ্টার পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলেই বাজিমাৎ।

এক ঘণ্টায় ইংরেজি রচনাটা মুখস্থ করতে না পারলে যেহেতু টেলিভিশনের সুন্দর সিরিজটি দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হবে, তাই ইচ্ছে করেই মনোযোগ বাড়িয়ে দিতাম বইয়ের পাতায়। ফলে হারার শাস্তি বলা যায় না। শেষে পাগল-টাগল ভেবে বসতে পারে। একবার এক পাগল দেখেছিলাম যে ছিল একেবারে আধুনিক পাগল। এই দেখেন, কোন কথার মধ্যে কোন কথায় এসে গেছি। এই এক দোষ আমার। এক কথার মাঝে আরেক কথা এসে যায়, তখন *ধান ভানা রেখে শিবের গীত* গাইতে শুরু করি।

বলছিলাম বাজি ধরেছি বন্ধুদের সঙ্গে। পাচশ টাকায় বাজি! কলেজে আমাদের ইয়ারে একটা মেয়ে ভর্তি হয়েছে। রানী না ঋণী কি যেন নাম। দারুণ রূপসী! চোখ দুটি নায়িকা পূর্ণিমার মতো। মাথায় কুন্তল রাশি যেন বৈশাখের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। আচড়িয়ে বেণী বেধে মাথায় সাপের ফনা তোলে, রূপের অহংকারও আছে কানায় কানায়। স্বভাবে চঞ্চলা হরিণী। বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠে কলেজ ক্যাম্পাসে।

বন্ধুদের মাথায় গোলমাল লাগিয়ে দিয়েছে। কাউকে নাকি পাত্তাই দেয় না। আমাদের রমণীমোহন বন্ধু মাসুদকেও নাকি ঘোলা পানি খাইয়ে ছেড়েছে, বাকিরা তো চুনোপুটি।

এসব ব্যাপারে আমি বরাবরই উদাসীন, বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। কিন্তু বন্ধুদের কথায় এই দুঃসাধ্য কাজটার প্রতি কেন জানি সেদিন প্রচণ্ড আগ্রহ বেড়ে গেল। অজস্র কাটার ভেতর থেকে লাল গোলাপ কুড়াতেই তো আনন্দ বেশি। তাই বাজিটা ধরে ফেললাম। পাচশ টাকার বাজি! শর্ত হচ্ছে কলেজ গার্ল এই সুন্দরীর সঙ্গে

হ্যান্ডশেক করতে হবে। যে মেয়ে সহপাঠী–ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে নাক সিটকায় তার হাত ধরা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তবুও বাজি ধরেছি। তাই চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকতে পারে না।

নিজে থেকেই পরিচিত হই। কলেজ ছুটির পর বাসায় ফেরার জন্য ও যখন দাড়িয়ে থাকে তখন রিকশাটা খুজে দিই। নোট দিয়ে খাতির জমানোর চেষ্টারও কমতি নেই। নিজের আচরণে আরো নতুন মাত্রা যোগ করি যেন সুবোধ, শান্ত ছেলে আমি। ওর অপছন্দের জিনিসগুলো বান্ধবীদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি। আস্তে আস্তে কথা বলার সুযোগ হয়। কিন্তু হাত ধরা কি চাট্টিখানি কথা! তবে একটা সুযোগ আছে।

আগামীকাল কলেজ থেকে পিকনিকে যাওয়া হবে মাধবকুণ্ডে। আমার চোখের সামনে তৎক্ষণাৎ ভেসে ওঠে মাধবকুণ্ডের ঝরনাধারার অপরূপ দৃশ্য। কলেজের সহপাঠী ছেলেমেয়েগুলো সবাই আনন্দে মেতেছে। পাহাড়ি উচু টিলা ডিঙিয়ে উপরে উঠছে অনেকেই। সেও উঠতে চায় কিন্তু পারছে না। আমি হাতটা বাড়িয়ে দিই। ও অগাধ বিশ্বাসে আমার হাত ধরে। কতো কোমল ওর হাত যেন কাশফুলের নরম ছোয়া।

তবে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায় আমার। বান্ধবীদের সবাই পিকনিকে গেলেও ও যায়নি।

পরদিন কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কয়েকদিনের ছুটি। দেখা–সাক্ষাৎ নেই। সেদিন বিকেলে বাজার করতে বেরিয়েছি।

হঠাৎ দেখি রূপায়ণে দাড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে।

সঙ্গে দুই বান্ধবী।

না দেখার ভান করে ঢুকে পড়লাম।

আমাকে দেখে অনেকটা বিস্ময়ের সঙ্গে নিজে থেকেই ও জিজ্ঞাসা করলো, আরে আপনি! কেমন আছেন?

ভালো। তুমি, মানে আপনি কেমন আছেন?

আপনি আমাকে তুমি করেই বলতে পারেন। সহপাঠীদের মধ্যে আপনাকেই সেই অধিকারটা দিলাম।

ধন্যবাদ জানানোর অবকাশ না দিয়েই ও আবার জিজ্ঞাসা করে, তা এখানে কিছু কিনতে এসেছেন বুঝি?

এবার সমস্যায় পড়ে গেলাম। কি কেনার কথা বলবো? রূপায়ণে সব জিনিসই খুম দামি। এই মুহূর্তে পকেটে বাজার করার টাকা ছাড়া এক টাকাও বাড়তি নেই। কিনলেই সেটা হবে বাজেট বহির্ভূত। বাজার না নিয়ে মেসে ফিরলে বন্ধুরা কিলিয়ে ভূত ছাড়াবে। না কেনার মতো কিছু কি আছে! সারি সারি সাজানো জিনিসগুলোর দিকে চোখ রাখলাম। ও উত্তর না পেয়ে আবারো জিজ্ঞাসা করলো, কই বললেন না কেন এসেছিলেন?

ও হ্যা, হরীতকী কিনতে এসেছিলাম। ইতস্তত করে জবাব দিই।

আমার কথা ওর বিশ্বাস হলো কি না জানি না, বান্ধবীদের চিমটি কেটে মুখে খানিকটা হাসির রেখা টেনে বললো, এখানে হরীতকীও পাওয়া যায় নাকি?

ডিপার্টমেন্ট স্টোর তো। ভাবলাম থাকতেও পারে। বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করি।

এবার ওদের বিদায় নেয়ার পালা। বিল দেয়ার জন্য কাউন্টারে গেলে পরিশোধ করার আগ্রহ দেখালাম।

ও বললো, না থাক, আপনার টাকাগুলো খুইয়ে লাভ নেই।

সবার সঙ্গে লাভ, ক্ষতির হিসাব যে চলে না এ কথা ওকে কি করে বোঝাই। সুন্দরী তো জানে না, তার জন্য রূপায়ণ–এর সবগুলো আইসক্রিম কিনে ফেলতে পারি। কলেজ ছুটির পর রিকশাগুলোকে দাড় করিয়ে রাখতে পারি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

অনেক দিন পর কলেজ খুললো। বাজির ব্যাপারে কতো দূর অগ্রসর হলাম বন্ধুরা জানতে চাইলো। বললাম, যথেষ্ট উন্নতি। এবার শুধু বাজিমাৎ করার পালা।

কলেজে অনেক খোজাখুজি করে সুন্দরীকে পেলাম না কোথাও। হঠাৎ দেখি কলেজের পুকুরপাড়ে গাছের ছায়ায় বসে বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করছে।

মনে মনে একটা প্ল্যান করি কাছে গিয়ে কথা বলার ফাকে পকেট থেকে চাবিটা ফেলে চলে আসবো। তারপর সে ওটা তুলে নিয়ে ফিরিয়ে দিতে যাবে আমাকে, আর ঠিক তখনি চাবিটি নিতে গিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অজুহাতে হাতখানা ধরে বলবো অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব সহজে বাজিটা পেয়ে যাবো আমি। এই ভেবে কাছে এগিয়ে যাই।

কাছে যেতেই সুন্দরী আমার সম্পূর্ণ পরিকল্পনা পাল্টে দিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে বলে, *আসুন, আপনাকে বাজিতে জিতিয়ে দিই।*

তার কথা শুনে আমি তো হতবাক! *ঘরের কথা পরে জানলো কি করে!* জিজ্ঞাসা করলাম, বাজি যে ধরেছি সেটা জানলে কি করে?

আমার গোয়েন্দা বান্ধবীদের কাছ থেকে। ও বললো।

আবারও জিজ্ঞাসা করি,প্রকাশ্য বাজির কথা নাহয় জানলে। কিন্তু মনে মনে যে আরেকটা বাজি ধরেছি এবং তার সঙ্গে যে আমার জীবন–মরণ সংশ্লিষ্টতা তা কি তোমার গোয়েন্দা বান্ধবীরা জানে?

না জানলেও টের পেয়েছি। তাই তো হেমায়েতপুরের একটি অগ্রিম টিকেট কিনে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি আপনাকে।

মানে! হতবাক হলাম।

মানে, আপনি যেভাবে পাগলামি শুরু করেছিলেন তাতে যে আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বেন সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না।

তার মানে, তুমি বলতে চাচ্ছো, আমি পাগল? একটু হেসে বললাম।

শুধু পাগল নয়, একেবারে বদ্ধপাগল।

ওর কথায় এবার সত্যিই পাগলামি শুরু করে দিই। হেড়ে গলা ছেড়ে দিয়ে গান ধরি, *আমায় পাগল যত বলুক লোকে, পাগল নইতো আমি, তুমি পাগল বললে আমায়, ধন্য যে পাগলামি...।*

হঠাৎ সুন্দরীর কি হয় জানি না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আমার ওপর। জীবনের প্রথম বাজিমাৎ করলাম আমি। তা দেখে বন্ধুদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। আর ওর বান্ধবীদের কথা কি আর বলবো, মুখ টিপে টিপে সে কি হাসাহাসি!

সিলেট থেকে

জর্জ ও লরা বুশের একটি রাত

– আবদুর রফিক খান

সম্প্রতি বৃটেন সফরকালে বাকিংহাম প্যালেসে রাতে থাকতে হবে জেনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন জর্জ ডাবলিউ বুশ। স্বামীর দুশ্চিন্তা দেখে লরা বুশ বিচলিত হলেন এবং এর কারণ জানতে চাইলেন।

বুশ বললেন, তুমি তো জানো, বাকিংহাম প্যালেসের একজন সিনিয়র সদস্য প্রিন্স চার্লস, সমকামিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। আর সেই প্যালেসেই কি না রাত কাটাতে হবে আমাকে। বিপদ আর কাকে বলে! ব্যাপারটি চিন্তা করতেও আমি আতংকিত হচ্ছি।

বাকিংহাম প্রাসাদে রাত কাটানোয় বিপদই বা কি আর আতংকিতই বা তুমি হচ্ছো কেন? লরা সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন।

আতংকিত হবো না? প্রতিটি সমকামিতার অবাঞ্ছিত ঘটনায় নায়ক বেছে নেয় একজন পুরুষকেই। আর অন্তত তুমি তো ভালো করেই জানো, আমি একজন পুরুষ। এমনিতেই বৃটেনের রানীর প্রাসাদটি বেশ সুরক্ষিত। প্রাসাদের বাইরে সিকিউরিটির কোনো অভাব নেই। কিন্তু ভয়টা যেখানে লুকিয়ে রয়েছে প্রাসাদের ভেতরেই, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের সময় বাইরের সিকিউরিটি কোনো কাজে আসবে কি? প্রাসাদের প্রতিটি রুম, গলি, ঘুপচি রাজকুমার চার্লসের নখদর্পণে। রাত্রিকালে কখন কিভাবে যে তিনি তার বিশেষ মতলবটি নিয়ে সুড়ুৎ করে আমার রুমে ঢুকে পড়বেন তা কে জানে! আমার দেশের প্রেসিডেন্টদের নারীঘটিত দুর্নাম থাকলেও পুরুষ ঘটিত কোনো দুর্নাম নেই। এবার মনে হচ্ছে সেই দুর্নামটিই চেপে বসবে আমারই ঘাড়ে। ওহ, মাই গড! বুশ তার দুই হাতে মুখ ঢেকে বললেন।

এ নিয়ে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করো না হানি। শুনেছি সমকামিতা হচ্ছে চার্লসের দ্বিতীয় অভ্যাস। প্রথম অভ্যাস হচ্ছে বয়স্কা রমণী। গডের কৃপায় আমার বয়স তো আর কম হলো না। সুতরাং তোমার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঘরে ঢুকলেও নায়কটি আমাকে দেখে তার প্রথম অভ্যাসটির বাস্তবায়নে তৎপর হবে। তারপর বাছাধনকে আর দেখতে হবে না। এমন ডোজ দিয়ে দেবো যে ব্যাটা আর সাত দিন তোমার স্বপ্ন দেখার ফুরসতই পাবে না। শোবার সময়ে তুমি শুধু আমার বিছানাটা দরজার পাশেই পাতবে। এবং তোমার খাটটা ঘরের অন্য কোণায় সরিয়ে নেবে। লরা অভয় বাণী দিলেন।

উত্তরা, ঢাকা থেকে
khanar@aitlbd.net

অপারগ

– জামান আফতাব

পেরছিলা। এক সাওতাল মেয়ে। কাজল কালো গায়ের রঙ, বেত ফলের মতো ডাগর চোখ, কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত চুল, বয়সের তুলনায় একটু স্ফীত বক্ষ, নিখাদ শারীরিক গঠন। বয়স চোদ্দ।

আমার বয়স তখন আঠারো। ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি সবেমাত্র। আর্থিক অনটনের কারণে শহরে থেকে ভর্তি কোচিং করা সম্ভব হয়নি। ভর্তির টাকা জোগাড়ের জন্য বোরো মরসুমে শ্যালো মেশিন চালিয়ে ধানের আবাদ করে, পাশাপাশি মেশিন ঘরে বসে ভর্তি গাইড মুখস্থ করি।

আমার বাড়ি বরেন্দ্র ভূমি এলাকায়। আমাদের পরিবারের চাষাবাদের বেশির ভাগ কাজই করে সাওতাল মেয়েরা। এদেরই একজন পেরছিলা। সবেমাত্র ক্লাস নাইনে উঠেছে। স্কুলে তখনো ক্লাস শুরু হয়নি।

স্কুল বন্ধের সময়ে সাওতাল মেয়েরা মাঠে কৃষি কাজ করে টাকা উপার্জন করে। আর সাওতাল মহিলারা কাজ করে সারা বছরই। সকালে খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বের হয় তারা। সারা দিন আর কিছু খাওয়া হয় না। কারণ, বলা হয়, তারা শুয়োর, ইদুর খায় তো! তাই মুসলমান গৃহস্থ তাদেরকে প্লেটে ভাত খাওয়ানো গর্হিত কাজ ভাবে।

সারা দিন না খেয়ে এক নাগাড়ে কাজ করা, বিশেষ করে পেরছিলা-র মতো অল্প বয়স্ক, কোমল বাড়ন্ত শরীরে অসহনীয় কাজের ধকলে আমার বিবেককে নাড়া দেয়। তাই মাকে বলে-কয়ে দুপুরে তাদের জন্য চালভাজা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি, সঙ্গে গুড়।

প্রথম দিন চাল ভাজা নিতে সে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল। খেতে খেতে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবু, তুমি কি পড়ো?

উত্তর দিই, ডাক্তারি ভর্তির জন্য পড়ি।

ও তুমি ডাক্তার হবে! ভালো ভালো, হামাকে মাগনা ওষুধ দেবে না?

আমি হেসে বলি, অবশ্যই দেবো।

দেবে কেমনে? তুমি তো শহরে থাকবে, একটা মেম বিয়ে করবে, গেরামে আসবে না। আমার চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

আশ্বস্ত করি, না, না, আমি ডাক্তার হয়ে গ্রামেই ফিরে আসবো। গ্রামেই বিয়ে করবো।

পেরছিলা বলে, তাহলে হামিও আজীবন তোমার জমির কাজ করে দেবো।

আজীবন জমির কাজ করবে কেন? তুমি ভালোভাবে লেখাপড়া করে চাকরি করবে।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হামাদের লেখাপড়া? কপালে নেই, বাবু।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টাই। ডালা থেকে আমিও চাল ভাজা খেতে খেতে বলি, পেরছিলা, একটা সাওতালি গান শোনাও না।

সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, সাওতালি গানের তুমি কি বুঝবে?

আমিও হেসে বলি, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দেবে।

ঠিক আছে।

আর শোনো, তুমি আমাকে সাওতালি ভাষা শেখাবে কিন্তু। তোমরা আমাকে গালি দিলেও তো আমি বুঝি না।

পেরছিলার হাসি বেড়ে যায়। সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলতে থাকে যেন। আমি তাকিয়ে থাকি।

শোনো, তুমি আমাকে প্রথম যে কথাটা শেখাবে তা কি জানো?

সে মাথা নাড়ায়, জানি না।

তুমি প্রথম আমাকে শেখাবে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

সে লজ্জা পায়। একটু পরই আবার কথা শুরু করে? বাবু, তুমি ভালোবাসো না কাউকে?

হেসে উত্তর দিই, পড়ার চাপে সময় পাইনি। তবে এখন কোথাও ভর্তি হতে পারলে কাউকে ভালোবাসার চেষ্টা করবো। তুমি কাউকে বাসো নাকি? আমি পাল্টা প্রশ্ন করি।

লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। না সূচক মাথা নাড়ায়।

এমনিভাবে প্রতিদিন কাজের মাঝে কথা হয়। জমির আলে বসে পেরছিলার গান শুনি।

কোনোদিন কাজ না থাকলেও পেরছিলা বিকেলে আসে গল্প করতে।

আমি অন্যান্য শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে দিই যাতে পেরছিলার প্রতিদিন কাজ হাতে থাকে।

কোনোদিন কাজ না থাকলেও অন্য কারো কাজে যায় না। বিকেলে চলে আসে গল্প করতে।

আমারও যেন রুটিন হয়ে যায়। তার অপেক্ষায় ছটফট করতে থাকি। পড়া কিচ্ছু হয় না।

সাওতালরা চৈত্র সংক্রান্তি জাকজমকভাবে পালন করে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই, চৈত্র সংক্রান্তিতে পেরছিলা–কে সালোয়ার কামিজ উপহার দেবো। একটা লাল কামিজ ও সবুজ সালোয়ার কিনি।

পহেলা বৈশাখের বিকেলে পেরছিলা দেখা করতে আসে। হাতে তিলে খাজা ও চিনির বড় বড় কদমা।

বুঝতে বাকি হয় না, আমার জন্যই এগুলো মেলা থেকে এনেছে। সালোয়ার কামিজ দিয়ে দিই।

আনন্দে তার চোখে পানি টলমল করতে থাকে। সে কাপতেও থাকে। তিলে খাজা দেয়ার জন্য আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

নিজেকে সংরবরণ করতে পারি না। হাত ধরে ফেলি। বলি, আমাকে খাইয়ে না দিলে খাবো না।

সে বলে, তা হয় না বাবু, কেউ দেখে ফেললে তোমাকে একঘরে করবে।

আমি হাত আরো শক্ত করে চেপে ধরি। বলি, করুক একঘরে।

পেরছিলা আরো কাছে আসে। আমাকে খাইয়ে দিতে থাকে।

দুষ্টামি করে আঙুলে কামড় দিই।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

নিজেকে মুক্ত করি।

মেশিন ঘরে পেরছিলা ও আমি একা।

আমার একটা ইচ্ছা রাখবা বাবু। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। পেরছিলার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

অভয় দিয়ে বলি, কি ইচ্ছা বলো।

সে কিছু আর বলে না। আমার ডান হাতটি নিয়ে তাতে চুমু খায়।

আমার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। ইচ্ছা হয়, প্রচণ্ড ইচ্ছা হয় পেরছিলাকে জড়িয়ে ধরি, আদর করি। কিন্তু পারি না, দমে যাই। কুকড়ে যাই সমাজের ভয়ে।

পরদিন থেকে পেরছিলা আর কাজে আসেনি, আর কখনো দেখা হয়নি।

ডাক্তার হতে পারিনি। হয়েছি কৃষিবিদ। মাঠে ধান নিয়ে গবেষণা করি। শ্রমিক খাটাই। জমির আলে বসে কাজের তদারক করি। খুব মনে হয় তখন পেরছিলার গানের কথা, তার কথা।

শাসনগাছা, কুমিল্লা থেকে

চেইন

– এম.এইচ. রশীদ ঝিলন

আমি একজন কাটা কাপড় ব্যবসায়ী। কাস্টমার নিয়ে আমার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে।

একদিন এক কাস্টমার ভাবীকে বললাম, ভাবী, কিছু লাগবে না?

ভাবী তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন, লাগাইলে লাগবে।

আমার প্রশ্নের উত্তর শুনে আমি তো থ।

আরেকদিন এক হুজুর কাস্টমার তার গিন্নির জন্য সালোয়ার–কামিজ আমার ঘরের খলিফা দিয়ে তৈরি করেছেন। ডেলিভারির সময় হুজুর অভিযোগ করলেন, সালোয়ারের কেন সামনে দিয়ে চেইন (জিপার) দেয়া হয়নি।

আমার খলিফা যতোই হুজুরকে বোঝাতে চাইলো, মেয়েদের সালোয়ারে চেইন দেয়া হয় না। কিন্তু ওই হুজুর কাস্টমার বুঝতে চান না। অবশেষে আমার হস্তক্ষেপে হুজুরকে বোঝাতে পারলাম।

তারপরও হুজুর বললেন, আমরা হুজুর মানুষ। হাটুর উপরে কাপড় উঠানো কি ঠিক? যদি চেইন থাকতো তাহলে ফরজ তরক হতো না।

হুজুরের কথা শুনে আমার খলিফা মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

ভোলা থেকে

স্বীকৃতি

– তারেকুজ্জামান লিটন

পদার্থ বিভাগের ছাত্র হওয়ার জন্য কি না আমাকে বার বার *অপদার্থ* কথাটি শুনতে হতো। কথাটি সবচেয়ে বেশি বলতো আমার খালাতো বোন তিথি। আমি ছোটবেলা থেকেই পছন্দ করি। ভালোলাগা থেকে ভালোবেসে ফেলি। কিন্তু কখনো বলতে পারিনি।

তিথি ও মিলি দুই বোন। তিথি এইচএসসি ও মিলি ক্লাস এইটে পড়তো। খালা হাই স্কুলের শিক্ষিকা আর খালু ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। দুজনেই চাকরিজীবী হওয়ায় তাদের অনুপস্থিতিতে বাসায় যেতে সংকোচ বোধ করতাম। তাই মাসে তিন চার দিন গেলেও শুক্রবারে যাওয়াটাই উত্তম মনে করতাম।

বাসায় গেলে খালা ভালো করে খাওয়াতেন। আমার পড়াশোনার খোজখবর নিতেন। নিজের ভাই না থাকায় মিলি সব সময় ভাইয়া বলে ডাকতো আর আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো গল্প করতো। তিথি দূরে দূরে থাকতো, দেখেও না দেখার ভান করতো। সুযোগ পেলেই খোচা দিয়ে কথা বলতো।

আমি যখন থার্ড ইয়ারে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড হলাম তখন তিথি শুনে বলেছিল, অপদার্থ প্রথম হতে পারেনি।

তিথি ছিল মেধাবী আর সুন্দরী। এ ধরনের মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই একটু অহংকারী হয়ে থাকে। তারা নিজেকে ছাড়া আর অন্য সবাইকে খুব সাধারণ মনে করে। আর এ অবজ্ঞার বোধ থেকেই ইচ্ছামতো যে কাউকে অপমান করতেও তাদের খুব একটা আটকায় না। কাউকে অপমান করলে তারা বেশ আনন্দ পায় এবং তৃপ্তি লাভ করে।

তিথি যখন আমাকে এড়িয়ে চলতো, কোনো ভাবে ইনসাল্ট করতো তখন বুকের মধ্যে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করতাম।

তিথির প্রতি আমার দুর্বলতা তারা দুবোনই জানতো। আমার কোন কাজে তিথি সমালোচনা করেছে, অপদার্থ বলেছে তো আমাকে মিলি সব বলে দিতো। কখনো কখনো আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতো।

মিলি যদি আমাকে নিয়ে তিথিকে ইঙ্গিত করে কোনো কথা বলতো তাহলে তিথি কখনো উঠে চলে যেতো, কখনো বা মিলিকে ধমক দিতো কিংবা মিলির মাথায় মারতো।

কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বা কৃকেট খেলা দেখার সময় আমি ও মিলি হতাম একপক্ষে আর তিথি হতো অন্য পক্ষে।

আমার জন্য দুই বোনের মধ্যে সব সময় এক রকম ঝগড়াটে ভাব বিরাজ করতো।

তার টেস্ট পরীক্ষার পর খালা-খালুর অনুরোধে দুই বোনকে পড়ানোর দায়িত্ব নিলাম। এ কারণে সপ্তাহে চার সন্ধ্যায় নিয়মিত বাসায় যাওয়া হতো।

একদিন রিকশা ভাড়া দিতে গিয়ে দেখি ম্যানিব্যাগ ছেড়ে এসেছি। রিকশা দাড় করিয়ে কলিংবেল টিপতেই তিথির সঙ্গে দেখা। তিথিকে বলতে সংকোচ লাগছিল। তাই বললাম, মিলি কোথায়?

বললো, টয়লেটে গেছে।

বাধ্য হয়ে বললাম, তোমার কাছে কি খুচরা টাকা হবে? রিকশা ভাড়া দিতে হবে, ম্যানিব্যাগ ভুলে ছেড়ে এসেছি।

টাকা দিয়ে বললো, সরাসরি আমাকে বললেই পারতেন।

রিকশা ভাড়া মিটিয়ে যখন পড়ার টেবিলে বসলাম তখন দেখি দুই বোন ঘরের মধ্যে খুব হাসাহাসি করছে।

দুজন এক সঙ্গে বই নিয়ে বেরিয়ে এলো।

মিলি বললো, আপনি আসলেই অপদার্থ। খুচরা টাকা চাইলেই পারতেন, কেন ম্যানিব্যাগের কথা বলতে গেলেন?

তিথি জোরে ধমক দিল, মিলি চুপ কর।

পড়ার টেবিলে আমি যে চেয়ারে বসতাম তার সামনের চেয়ার ফাকা রেখে মিলি আমার পাশের চেয়ারে বসতো। মিলির ইচ্ছা আমরা যেন মুখোমুখি বসি। এ জন্য প্রতিদিন সে আগেই পাশের চেয়ারটি দখল করতো। তিথি যখন আমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় কৌতুক করে *স্যার* বলতো তখন আমি তার

উত্তরে তাকে *ম্যাডাম* বলতাম। মিলির পরামর্শে এ রকম বলতাম। মিলি তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতো। এ রকম অনেক কথা আছে যা বলে শেষ করা যাবে না।

প্রায় দেড় মাস পড়ালাম। কাছাকাছি বসা হয়, কথা হয়, শুধু মনের কথাটি বলা হয় না। কোথায় যেন শূন্যতা অনুভব করি। হলে ফিরে নিজেকে ভীষণ একা মনে হতে থাকে।

১৩ ফেব্রুয়ারি নিয়মিত পড়াতে গেলাম। পড়ানো শেষে নাশতা খাচ্ছি আর ভাবছি, আজকে পড়ালাম, কালকে না, তারপরের দিন আসতে হবে। তার মানে ১৪ তারিখে তার সঙ্গে দেখা হবে না। মনে মনে প্ল্যান করেছিলাম এবার ভালোবাসা দিবসে তাকে মনের কথা জানাবো। কিন্তু আজকে পড়িয়ে কালকে কোন অজুহাতে বাসায় আসবো? ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

দুঃখ ভরা মন নিয়ে যখন চলে আসছি তখন গেট পার হতেই একটু চিরকুট হাতে দিয়ে তিথি বললো, হলে গিয়ে পড়বেন।

ভাগ্যিস কেউ দেখতে পায়নি।

চিরকুটে লেখা আছে, *আগামীকাল ১১টায় বাসায় আসবেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে।*

অনেক সাতপাচ ভেবে পরদিন সময় মতো বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যাওয়ার সময় একটি গোলাপ কিনে পকেটে রাখলাম। বাসায় গিয়ে দেখি তিথি একা। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বললো, মিলি স্কুলে, বাবা–মাও বাইরে।

তাকে দেখে মনে হলো অন্যদিনের চেয়ে বেশি সেজেছে।

মুখোমুখি দাড়িয়ে বললো, *হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে।* আমার জন্য কি এনেছেন? দেন, তাড়াতাড়ি দেন কি এনেছেন।

পকেট থেকে গোলাপটা বের করে ধরতেই সে অবাক হয়ে গেল।

তার আবেগ আপ্লুতভাব দেখে সহজেই বলে ফেললাম সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে প্রিয় সেই কথাটি, আই লাভ ইউ।

সে বললো, আপনি এতো ভীতু কেন? আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি।

আমার তো আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। বললাম, কিন্তু তুমি?

উত্তরে বললো, আই লাভ ইউ অলসো।

সঙ্গে সঙ্গে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। জানি না কতোক্ষণ ছিলাম। তারপর থেকে একে অপরকে না দেখে থাকতে পারি না। আমাদের ভালোবাসা পবিত্র। ভালোবাসার কাছে পৃথিবীর সব কিছু তুচ্ছ মনে হয়।

ঘোড়ামারা, রাজশাহী থেকে

জুলিয়েট হনন বেলা

– রোমিও

আমি তার নাম দিয়েছি জুলিয়েট। জুলিয়েটের মতোই সে। ভীরু, শান্ত, সাধারণ। ভালোবাসার পাপড়িগুলো ডানা মেলতেই সে হয়ে ওঠে সাহসী, চঞ্চল, অসাধারণ। তার সঙ্গে ছোট বেলাতেই সখ্যতার শুরু। তার হাফপ্যান্ট পরা বয়সে কতোদিন যে তাকে কোলে বসিয়ে আদর করেছি এর ইয়ত্তা নেই। তারপর সাময়িক বিচ্ছেদ। তার পিতার চাকরিতে শহর বদলের জন্য।

তারা তখন হাওড় ও সীমান্ত সংলগ্ন জেলা শহরের বাসিন্দা। সুসম্পর্কের ফলে প্রায়ই তাদের বাসায় বেড়াতে যেতাম। তার বাবা, মা, বোনেরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন, সমাদর করতেন। তাদের পরিবারের ভালো

ছেলে হিসেবে বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছি। তখন সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কম্পানিতে চাকরি সূত্রে আমি ওই শহরের বাসিন্দা। সেই সময়েই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু।

তার এক বান্ধবীর বিয়েতে কমিউনিটি সেন্টার শাড়ি পরে জুলিয়েট আমাকে আলোড়িত করে। তার সরু উদাম কোমর আমার বুকে জাগায় ঢেউ। সেই তীব্র অনুভূতিকে কামনা ছাড়া আর কি বলবো!

আমার শরীর পুড়ে যাচ্ছে। মন বিক্ষিপ্ত। শয়নে–স্বপনে–মননে জুলিয়েট জুলিয়েট। তাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না। লজ্জাও পাচ্ছি। একি ভালোবাসা, নাকি কামনা এই নিয়েও দ্বিধা। দেহের মধ্যে কাচা ভালোবাসা কখন যে, দেহ থেকে বেরিয়ে একটি দুর্লভ অনুভবে পৌছাবে তার জন্য তো লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করে। না করে জ্বলে–পুড়ে মরে। এই উপলব্ধিতে পৌছাতে কতো মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়।

জুলিয়েটকে প্রেমের কথা জানাতেই সে সাড়া দেয়। তখন সে স্নাতক ক্লাস অধ্যয়নরতা। বেলা, অবেলায় শুরু হয় উদাম ডেটিং। যথানিয়মে বাধাও আসতে থাকে। জুলিয়েটের সাবেক প্রণয় প্রার্থী এবং এলাকার ছেলেরা এই বাধাদান প্রকল্পের উদ্যোক্তা।

এর মাঝেই দেখা হয়। ঠোট ছুয়ে দিই, হাত ছুয়ে দিই, বুক ছুয়ে দিই। জুলি প্রাণপণে বাধা দেয়। সেই বাধায় আগুন বাড়ে ছাড়া কমে না। কামনার আগুন প্রেমের আগুন আমাকে জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে মারে। পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এই আগুনের ধর্মই তাই।

সামনেই জুলিয়েটের জন্মদিন। সেই জন্মদিন পালনের আয়োজন করা হয় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাসায়। কিন্তু জুলি কিভাবে আসবে? চারদিকে শত্রুপক্ষের পাহারা। পথিমধ্যে রিকশার চাকায় লেগে কামিজ ছিড়ে যাওয়ার পরও সে এসে হাজির। তার পছন্দমতো পাজামা–পাঞ্জাবি পরায়। সে খুব খুশি হয়।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বন্ধুরা আমাদের দুজনকে একই রুমে ঢুকিয়ে তালা মেরে দেয়। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকি, চুমু খেতে থাকি।

প্রথমে ক্ষীণ বাধা দিলেও এক পর্যায়ে সে সাড়া দেয়।

আদরের ফাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তাকে প্রায় নগ্ন করে ফেলি। সে টেরও পায় না। তার ভেতরে প্রায় প্রবিষ্ট হই।

জুলিয়েট টের পেয়ে আতকে ওঠে, চমকে ওঠে, সচেতন হয়। সে ঝটকা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দেয়। বাধা দেয়, কাদতে থাকে।

সকল বাধা অগ্রাহ্য করে তাকে বাধ্য করি।

তারপর সে পরিপূর্ণভাবে আমাকে গ্রহণ করে। সেই সময়ে সে কাপছে এবং কাদছে। তার শ্যামল মুখ কষ্টে, বেদনায় নীল হয়ে যাচ্ছে। তার চোখ অশ্রুসিক্ত এবং দেহ রক্তাক্ত। সব কিছু শেষ হবার পর তাকে পরিষ্কার করার সময়ও সে অনবরত কাদছে।

আমি তাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলতে চাই, কেদো না। আমার গলায় স্বর ফোটে না। গলা বুজে যায়। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা হাতড়াই, তাতেও ব্যর্থ হই। আমার মনে হতে থাকে, আমি ক্রমেই প্রেমিক থেকে খুনিতে রূপান্তরিত হচ্ছি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

হরেক রকম

– এম.কে. জামান

পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের ভালোবাসা খাটি ও নির্মোহ। কোনো প্রতিদান এবং স্বার্থ ছাড়াই মা তার সন্তানকে ভালোবাসেন। মায়ের ভালোবাসার কাছে জগতের সকল ভালোবাসা অতি তুচ্ছ।

মাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। সে মমতাময়ী মা জননী আমি প্রবাসে আসার কিছুদিনের মধ্যে এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলাম। মায়ের মৃত্যুতে খুবই দুঃখ পেলেও বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছি। বাস্তব সত্য হলো – The call of death is a call of love and in the long run we are all dead. মৃত্যুর ডাক হচ্ছে ভালোবাসারই একটি ডাক এবং পরিশেষে আমরা সবাই হই মৃত। ভালোবাসার এদিনে আমার মায়ের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

১৪ ফেব্রুয়ারি আমার মেয়ের বয়স আট মাস দুই দিন হবে। মায়ের মৃত্যুর দুই মাস পর তার জন্ম। টেলিফোনে তার কান্না শুনেছি। কিন্তু এখনো দেখার সৌভাগ্য হয়নি। মায়ের মৃত্যু, সন্তানের জন্ম এসব অতি জরুরি সময় স্বজনদের পাশে থাকতে না পারা যে কতো বেদনার তা একমাত্র প্রবাসীরাই ভালো বলতে পারবে। পারিবারিক জন্ম, মৃত্যু, আনন্দ, বেদনা, ভালোবাসা সব কিছু থেকে প্রবাসীরা বঞ্চিত। মেয়েরা তাদের বাবাকে নাকি মায়ের মতো ভালোবাসে। তাই মায়ের মৃত্যুর পর মেয়ের জন্মে কথা শুনে মায়ের মৃত্যু শোক কিছুটা হলেও লাঘব হলো। আমার মেয়ের নাম কহন। ভালোবাসার এদিনে তাকে জানাই আমার জীবনের সবচেয়ে খাটি ও মিষ্টি ভালোবাসা।

প্রবাসীরা স্ত্রীদেরকে বেশি ভালোবাসে। সে হিসেবে আমিও তার ব্যতিক্রম নই। দূরে থাকার কারণে সংসার জীবনের ছোটখাটো ভুলগুলো বৃহৎ আকার ধারণ করে না। তাছাড়া প্রবাসে নানান দেশের লোকের সংস্পর্শে থাকার কারণে মানুষের মনমানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে। তাই ছোট ছোট ভুলগুলো তুচ্ছ করে স্ত্রীকে অধিক ভালোবাসার মাধ্যমে প্রবাসীরা সংসারকে সুন্দর করে সাজাতে চেষ্টা করে। প্রবাদ আছে, *চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়ে যায়।* কথাটা প্রবাসীদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কেননা আমরা দূরে থাকলেও আমাদের মনটা সারাক্ষণ দেশেই থেকে যায়। স্পেশাল দিন যেমন ঈদ, জন্মদিন, ভালোবাসার দিন ইত্যাদি হলে তো সে রাতে ঘুমই হয় না। ভালোবাসার এদিনে কলিকে জানাই অনেক ভালোবাসা।

সব ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে অর্থের ভালোবাসার কারণে বিদেশ এলাম। বিদেশিরা বাংলাদেশিদেরকে ভালোবাসে না। তারা শুধু ভালোবাসে আমাদের সততা ও কর্মনিষ্ঠাকে। সউদিরা বাংলাদেশিদের মিসকিন ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না।

কে কি ভাবলো তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। আমরা এসেছি শ্রমের বিনিময়ে টাকা উপার্জন করতে আর তা পেলেই আমরা খুশি। টাকা ভালোবাসে না কে? পরিবার–পরিজন, স্নেহ, ভালোবাসা সব কিছু ছেড়ে অর্থের ভালোবাসায় সউদি আরবে অবস্থান করলেও এ পবিত্র ভূমিতে আমাদের পরিশ্রমের সঠিক দাম পাই না। অনেকেই এখানে অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। তাছাড়া অনেকে কাজ করেও মাসের পর মাস বেতন পায় না।

হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর জন্মস্থান বিধায় মুসলমানদের তীর্থ স্থান সউদি আরব (মক্কা–মদিনা)। মুসলমানদের বিশ্বাস, মক্কা ও মদিনাকে ভালোবাসলে আল্লাহর সান্নিধ্যে লাভ করা যাবে। মুসলমানদের ধারণা, হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর জন্মভূমি সউদি আরবের লোকগুলো খুব ভালো এবং তারা ধর্মকে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু তাদের ধারণাটা সত্য নয়। নৈতিকতা বিবর্জিত এ দেশের মানুষ ভালোবাসে বাড়ি, গাড়ি আর নারী। যে দেশে পুরুষ শ্রমিকরা নানানভাবে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে সেখানে নারী শ্রমিক পাঠানোর বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত সঠিক হচ্ছে না।

সউদি আরব থেকে

স্বার্থহীন শর্তহীন সীমানাহীন

– মোহাম্মদ কামালউদ্দিন চৌধুরী

ভ্যালেনটাইনস ডে সম্পর্কে আমাদের বাংলাদেশে আগে কোনো ধারণা ছিল না। কয়েক বছর যাবৎ যায়যায়দিন তার পাঠকদেরকে আস্তে আস্তে ভ্যালেনটাইনস ডে সম্পর্কে লেখার সুযোগ করে দেয়। প্রথমদিকে ভ্যালেনটাইনস ডে-কে একটি *ভিন্ন সংস্কৃতি* বলে অনেকে কূপমন্ডূকতায় ভোগে। কিন্তু যায়যায়দিন ও তার পাঠকদের কলম থেমে থাকেনি, বরং এক সংখ্যার পর অন্য সংখ্যাটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

যারা একদিন যায়যায়দিনের ভ্যালেনটাইনস ডে-র বিশেষ সংখ্যাগুলোর সমালোচনা করতেন তারাই আজ তাকে সমর্থন করছেন।

১৪ ফেব্রুয়ারিই হচ্ছে ভ্যালেনটাইনস ডে আর আমি আমেরিকায় আসি তার পরে জুলাই মাসে।

পরের বছর সকালে দোকানে বসে আছি। প্রায় সকল কাস্টমারই এসে জিজ্ঞাসা করছিল তোমার কাছে ফুল আছে? গোলাপ অথবা অন্য ফুল? কিংবা নকল ফুল, যে ফুল কাগজ বা কাপড় দিয়ে তৈরি।

সবাইকে একই জবাব দিচ্ছিলাম, না, ফুল নেই। পাশের ফুলের দোকানটি দেখুন।

আমার দোকানটি ছিল একটি বাসস্ট্যান্ডে, লোকজনের যাতায়াত সব সময় বেশি। কারো গন্তব্যস্থল এখানে এসে শেষ হয়ে যায়। আবার কেউ এখান থেকে অন্য বাসে ট্রান্সফার নেয়।

সকালে দোকান খোলার পর থেকে দেখছি, সবার হাতে ফুল – শিশু, কিশোর, জোয়ান, বুড়োবুড়ি কেউ খালি হাতে নেই। কারো কারো হাতে রয়েছে একাধিক ফুল। বেশির ভাগই সুগন্ধযুক্ত গোলাপ। উৎসুক চোখে দেখছিলাম। বার বার একটি প্রশ্ন মনে আসছিল। ছেলেরা মেয়েদেরকে অথবা মেয়েরা ছেলেদেরকে ফুল দিয়ে তাদের প্রেমিক-প্রেমিকাকে প্রেম-ভালোবাসার কথা জানাচ্ছে। কিন্তু ওই শিশু-কিশোর, বুড়োবুড়ির প্রেমিক-প্রেমিকা কে বা কারা? তাদের হাতে ফুল কেন?

আমাকে আমার জিজ্ঞাসার জবাব পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ক্যারল নামের আমার পূর্ব পরিচিত এক উরুগুয়ে-র মহিলা আমার দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাকে আজ কেউ ভ্যালেনটাইনস ডে-র উইশ করেনি?

জবাবে বললাম, এখানে আমার স্ত্রী অথবা প্রেমিকা কেউ নেই যে, আমাকে উইশ করবে।

সে মুচকি হেসে আমার দিকে একটি ডাটাসহ সুগন্ধযুক্ত লাল গোলাপ ফুল বাড়িয়ে দিয়ে বললো, হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে টু ইউ।

অবাক হয়ে বললাম, একি!

তুমি কি তোমার প্রেমিককে ফুল দাওনি? নাকি তোমার প্রেমিককে ছেড়ে আমাকে তুমি প্রেমিক বানাচ্ছো?

সে এবার কলকলিয়ে হেসে উঠলো। বললো, তোমার দেশে তোমরা কি শুধু স্ত্রী ও প্রেমিকাকে উইশ করো?

বাংলাদেশে বারো মাসই আমাদের ফেরিওয়ালারা ফুল বিক্রি করে। হাজার টাকার বাজার থলে ভরে নিয়ে এসেছি। কিন্তু শুধু স্ত্রী নয়, কোনো প্রিয়জনকেও পাচ দশ টাকার রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে উইশ করিনি। কারণ, পাছে লোকে কিছু বলে!

ক্যারল-কে মিথ্যাই বললাম, হ্যা, আমাদের বাংলাদেশে আমরা শুধু স্ত্রী ও প্রেমিকাকেই ভ্যালেনটাইনস ডে-তে উইশ করি।

সে বললো, আসলে তোমরা একটা কিপটে জাতি, ভ্যালেনটাইনস ডে শুধু একজন নয় অথবা নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসার প্রতীক নয়। তোমরা ভ্যালেনটাইনস ডে-কে একটি গণ্ডির মধ্যেই বেধে ফেলেছো। মানুষ হিসেবে আমাদের ভালোবাসা কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই বেধে রাখাটাই অন্যায়। মানুষের ভালোবাসার

পরিধি ব্যাপক। যেমন তোমাকে ফুলটি দিলাম আমি তোমাকে ভালোবাসি বলেই তাই বলে তুমি আমার প্রেমিক হতে হবে এ শর্তে নয়। তুমি মানুষ আমিও মানুষ। আমাদের ভালোবাসার কোনো স্বার্থ নেই, কোনো শর্তও নেই। আমাদের ভালোবাসার নাম *মানবতা*। এক মানুষ অন্য মানুষকে ভালো না বাসলে আমাদের পৃথিবীটা নরকে পরিণত হবে। খুনোখুনি, হানাহানি পৃথিবীতে লেগে থাকবে। যখন আমরা কেউ কারো বন্ধু হতে পারবো না তখন তো আমরা একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হতে বাধ্য।

ডাটাসহ লাল গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে আমাদের সামনে দিয়ে একটি শিশু হেটে যাচ্ছিল। ক্যারল আমাকে শিশুটির প্রতি দেখিয়ে বললো, ওই দেখো অবুঝ শিশুটি। তার কি এখন প্রেম করার বয়স? না! সে হয়তো তার মা, শিক্ষক কিংবা প্রতিবেশী বন্ধুদের কাউকে ফুলটি দেবে। ওই ফুলটিই তার ক্ষুদ্র মনের ভালোবাসার প্রতীক।

তার কাছ থেকেও আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা নেয়ার আছে। ক্ষমতার দম্ভে অত্যাচারী শাসকরা আমাদের শান্তির পৃথিবীটাকে যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত করছে। প্রতিনিয়ত লুণ্ঠিত হচ্ছে মানবতা। তাই বলে তারা কি মানবতাকে ধ্বংস করতে পেরেছে? না, তারা তা পারেনি, পারবে না! কারণ, তাদের ধ্বংসের পাশাপাশি শান্তিকামী মানুষেরা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলছে। এরই নাম *ভালোবাসা*। ভালোবাসা দেখা যায় না, উপলব্ধি করা যায়। এই উপলব্ধিকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। কেননা ভালোবাসার উৎপত্তি স্থল হচ্ছে মন। তারা দেহকে ধ্বংস করতে পারে, মনকে নয়। এ জন্যই তো ধ্বংস্তস্তূপের মাঝেও ভালোবাসা মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে। এটাই ভ্যালেনটাইনস ডে-র মূল কথা।

মুগ্ধ হয়ে ক্যারল-এর কথাগুলো শুনছিলাম আর ভাবছিলাম আমার দেশের কথা। আমরা এক জাতি, এক দেশি হয়েও রাজনীতির নামে হানাহানি, খুনোখুনি করছি। আমরা কি পারি না নেতানেত্রীদের প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয়ে একে অন্যকে ভালোবাসতে? আসুন, আমরা আমাদের লোপ পাওয়া মানবতা ও ভালোবাসাকে পুনরুজ্জীবিত করি।

দুবাই থেকে
kchowdury@hotmail.com

ছোট পোশাকের গল্প

– কাব্য কামরুল

ব্রা-টি লাল টুকটুকে। ঝুলে আছে শিল্পীদের এক তলা ছাদে।

পাশে কচি লেবুর পাতা রঙের সালোয়ার কামিজ।

তার পাশে শাদা ধবধবে প্যান্টি।

কড়া রোদ্দুরে জিনিসগুলোকে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রফিকের চোখে তারে ঝুলে থাকা দৃশ্যটি বেশ লাগে। একটা শৈল্পিক রূপ ধরা পড়ে তার চোখে।

ব্রাটির দিকেই রফিকের দৃষ্টিটা প্রবল। চৌত্রিশ ইঞ্চি বড় সাইজ। আনাড়ি হাতে রফিক কিনেছিল। কতো কিছুই না শিল্পীকে গিফট দেয়া হলো। এবার ভিন্ন একটা গিফট দেবে। এই ভেবে রোমান্টিক গিফটটি দেয়া। ব্রাটি কেনার সময় রফিকের সে কি লজ্জা!

দোকানদারকে ধীর কণ্ঠে বললো, ভাই, আপনার কাছে ভালো ব্রা হবে?

সামান্য কথাটি বলতে রফিকের ঘাম ঝরে। মনে হচ্ছে কোনো নিষিদ্ধ অবৈধ জিনিস চুপিসারে কিনছে। ধরা পড়লে মারা পড়বে।

র‍্যাপিং পেপারে মুড়ে তার ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে রফিক লিখে দিল –

আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে
ছোট্ট দুটি দেশে
থাকুক মিশে মিশে
পরম ভালোবেসে...

গিফটটি শিল্পীর হাতে দেয়ার পর রফিক শর্ত দিল, গিফট আমার সামনে খুলতে পারবে না। বাসায় গিয়ে খুলবে।

শিল্পী কথা না বাড়িয়ে নিজের ব্যাগের মধ্যে গিফটটি রেখে দেয়। বাসায় ফেরার পথেই শিল্পী প্যাকেটটি খুলতে থাকে। একটার পর একটা প্যাকেট দিয়ে আটকানো। তীব্র কৌতূহলে তার হাত কাপে। রফিক এমন কি দিল যে, একটার পর একটা র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মুড়তে হবে!

অবশেষে প্যাকেটটি থেকে আবিষ্কার করে তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসটি। বিষয়টায় একটা রোমান্টিক দোলায় দুলতে থাকে শিল্পী।

খুলনা থেকে

পোস্ট না করা এক চিঠি

– কুমু

আগে অফুরান জীবনীশক্তি নিয়ে কাজ করতো সোমা। কাজের মাঝেই বেচে থাকার আনন্দ খুজে পেতো। এখন একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, অর্থহীন মনে হয়। তবু পুরনো অভ্যস্ততায় দিন যায়। রাত বয়ে নিয়ে আসে নিঃসীম শূন্যতা আর দম বন্ধ করা এক বিষণ্ণতা, অবসন্নতা। ক্লান্ত দেহ, তবু ঘুম আসে না সোমার। সযত্নে রাখা নিজেরই লেখা চিঠি খাম থেকে বের করে ধীরে ধীরে ভাজ খোলে, সঙ্গে তার জীবন অতীতের ভাজ খোলে। বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। চোখ জলে ভরে ওঠে।

শেষ লাইনটি আগে পড়ে সোমা। এটাই শেষ। পুরো পাতা জুড়ে এ দুটো শব্দ বড় বড় অক্ষরে ভেসে ওঠে। আর কিছু পড়তে পারে না। ক্ষণিকের অভিমানে লেখা কথাগুলো এমন নির্মম নিয়তি হয়ে যাবে তার জীবনে! সোমা কি জানতো সত্যি সত্যি যে, ওই দিনই সব শেষ হয়ে যাবে এমন করে। আপন শূন্য ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। আচলে চোখ মুছে সোমা পড়ে। নিজের অতীত নিজেরই জবানিতে।

প্রিয়...,

আজ ৮ মার্চ ২০০২ শুক্রবার রাত সাড়ে দশটা। কথা ছিল প্রতিদিন একটা করে চিঠি লিখবো আমরা। যদি দুলাইন লেখা সম্ভব হয় তাহলেই যেন আমরা একজন আরেকজনের স্পর্শ পাই প্রতিদিনই। আমার কথা ঠিকই আমি রেখেছি। তুমি কথা রাখোনি। গত দুবার বাড়ি গেলে, নানান অজুহাত দিয়েছো। এবার দশ দিন হয়ে গেল, তোমার একটিও চিঠি পাইনি। কয়েকদিন ধরে মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। শুধু তোমারই জন্য কোনো কাজে মন বসে না। অফিস তো আর মন খারাপ বুঝবে না, যেতেই হয়।

গতকাল অফিসে হঠাৎ তোমার টেলিফোন। কিন্তু কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। শো শো, ঘরর–ঘরর বিরক্তিকর আওয়াজ। সব রকম আবেগ অবদমিত করে অশোভনীয়ভাবে চিৎকার করে কথা বলার ব্যর্থ চেষ্টা, লাইন কেটে গেল। বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল মন। ফের তোমার ফোনের অপেক্ষা। সারা দিন আর ফোন না পাওয়া কি

যে কষ্টকর! এসব কিছু কাউকে বুঝতে না দিয়ে বাইরে চলাফেরা, কাজকর্ম করা এ বেদনাময় যন্ত্রণা তুমি বোঝো কি? আমাদের এ দূরত্ব বড় নির্মম, বড় কষ্টের। জীবনেরই তাগিদে মেনে নিতে হয়।

ঘরে ফিরে চুপ করে শুয়ে থাকা, বেদনায় নীল হতে হবে। তোমাকে মনের মধ্যে নাড়া চাড়া করা। তুমি করো কি? কি যে জানতে ইচ্ছা করে! তুমি লিখছো না কেন? এ যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা, বুকের মধ্যে কষ্ট লালন করা। ভাবি কেমন পাষণ্ড মানুষের ঘরণী হলাম। দায়িত্ব বোধ, ভালোবাসা তোমার মধ্যে এতো কম কেন? চিঠিতেও তো প্রেম হয়, নাকি? বিয়ে করেছি কি জাগতিক সকল কাজ যন্ত্রের মতো করে যাবো বলে! আমরা তো কেউ কাউকে বোঝারই সুযোগ পাচ্ছি না।

তিন মাস হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে। সব মিলিয়ে ষোল দিন এক সঙ্গে ছিলাম। একত্রে বসবাসের তো কোনো উপায় দেখছি না। একজন আরেকজনকে চিনতে হবে, জানতে হবে। সেটি কিভাবে সম্ভব! চেষ্টা করছি নিজেকে তোমার কাছে মেলে ধরতে, কাছে আসতে। তুমি ঠিক এর বিপরীত আচরণ করছো।

এবার বাড়ি গেলে আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলোনি, কেমন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছো। আমার এখানে আসতে বলছি, একবারও আসোনি। বলেছো, এখানে দেখার কেউ নেই, কিভাবে যাই। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কিছু কেমন রহস্যময় ঠেকছে। তোমার এই ঔদাসিন্য আমায় খুব ব্যথিত করছে, দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। কিভাবে নিশ্চুপ থাকো এমন? ঠিক আছে, আমিও আর লিখবো না। এটাই শেষ।

ইতি

তোমার বৌ।

সে রাতে সোমা তার স্বামীকে লেখা চিঠি এভাবেই শেষ করেছিল। অফিসে যাওয়ার পথে পোস্ট বক্সে ফেলবে। কাজটি প্রতিদিন সে নিজ হাতেই করে। দেখে ঘড়ির কাটা রাত বারোটার ঘর ছুই ছুই করছে। সারা দিনের কর্মক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দেয় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকাল নটায় অফিসে পৌছা মাত্র ফোন আসে বাড়ি থেকে। জগৎ বিদীর্ণ করা মর্মান্তিক খবর। তার স্বামী হাসপাতালে, স্ট্রোক হয়েছে। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না সোমার। সামনের চেয়ার–টেবিল, অফিস রুম সব কেমন দুলে উঠলো।

দুঃসংবাদ শুনে দাড়িয়ে গিয়েছিল সোমা। ফোনের রিসিভার রেখে চেয়ারের হাতল ধরে ধপ করে বসে পড়লো। শক্ত ধাচের মেয়ে সে। জীবনে অনেক কঠিন দুঃসময় পার করেছে দৃঢ়তার সঙ্গে, বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় বাবা মারা যায়। ছোট ভাইবোনদের মানুষ করার জন্য নিজের সুখের কথা ভাবেনি সে। বিয়ে করা কোনোদিনই জরুরি মনে করেনি। বাবার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় মায়ের সহযোদ্ধা হয়ে দায়িত্ব পালন করাকে সঠিক কাজ মনে করেছে বড় সন্তান হিসেবে।

মা তাকে প্রায়ই বলতেন, তোমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলে তুমি খুব একা হয়ে যাবে, তখন সময় থাকবে না।

ইদানীং সে এটা বেশ বুঝতে পারছিল। এক বন্ধুর মধ্যস্থতায় প্রায় সাইত্রিশ–এ তার বিয়ে। একে তো লেট ম্যারেজ, তার উপর মধ্য চল্লিশের স্বামীকে তার কিছুটা জীবন বিমুখী মনে হতো। এ নিয়ে সে সমস্যা ও দুশ্চিন্তার দুই কূলের মধ্যে ছিল। সোমা চোখ বন্ধ করে নিজেকে সামলায়, মনে শক্তি আনে।

কর্মস্থল থেকে স্বামীর বাড়ি গিয়ে পৌছাতে তার সন্ধ্যা লেগে যায়। উঠানে খাটিয়ায় শোয়া নিথর দেহের পাশে হাটু গেড়ে বসে সোমা। রাতে লেখা চিঠিটা তার ব্যাগেই ছিল। ড্রপ করতে ভুলে গিয়েছিল। নিজের অজান্তেই খামটি স্পর্শ করে। গভীর বেদনা ও শূন্যতা অনুভব করলো সোমা। পরপারের চিঠি পেয়ে আসল ঠিকানায় চলে গেছে প্রাণহীন নিশ্চল মানুষটা। এখন দায়–দায়িত্ব, অভিমান–অভিযোগ সব কিছুর ঊর্ধে।

সোমা আকাশের দিকে তাকালো। এ কেমন দয়া তোমার, তুমি নাকি দয়ার সাগর। উগত কান্না বুক ঠেলে ওঠে। কাদে সোমা। অঝোরে কাদে।

মেয়ের জীবনে এ নিষ্ঠুর পরিণতি সোমার মা হয়তো সহ্য করতে পারেননি। তিনিও চলে গেলেন পরপারে। অনুভবে দুঃসহ এক বেচে থাকা প্রতিদিন চোখ বন্ধ করে সোমা। এক প্রতিবেশিনীর বিলাপ তার কানে ভেসে আসে।

গত দুই বছরে তিনবার মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিল, তুমি জানতে না?

একাকী শূন্য ঘরে সোমা প্রতিধ্বনি শুনতে পায়, তুমি জানতে না?

সোমা আজ বড় একা পৃথিবীতে! প্রায় সারা রাত নির্ঘুম কাটে তার। প্রতি রাত।

ঢাকা থেকে

বিশ্বাস ভালোবাসা অতঃপর...

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি সংসার নামের ক্ষেত্রটিতে আমার মা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অসম্মান, অপদস্থ সব রকমের নিষ্ঠুরতা এবং যন্ত্রণা মুখ বুঝে হজম করছেন। তাই *সংসার* নামের ক্ষেত্রটি শিশুকালেই আমার কাছে *নরক* বলে পরিচিতি পায়।

বড় হওয়ার পর যখন চারদিকে নোংরামি, বর্বরতা আর হিংস্রতা দেখি তখন কষ্ট পাই। যন্ত্রণা আমাকে আরো কুকড়ে দেয় উচ্চ শিক্ষিত, সম্মানিত, শ্রদ্ধাভাজন গুরুজনদের অশালীন ইঙ্গিত এবং আচরণ। যখন রাস্তাঘাট ও অফিসে শিকার হই বিকৃত ব্যবহারের। লজ্জা, ঘৃণায় কাটা মুরগির মতো ছটফট করি পবিত্র প্রেম-ভালোবাসার নামে রুচিহীন মানুষের অশ্লীল, অবৈধ কার্যক্রমের ঘটনা শুনে, দেখে।

আমার পরিবারের বহুবিধ সমস্যা আর সমাজের নানান অবক্ষয় আমাকে প্রেম-ভালোবাসা, বিয়ে-সংসার এগুলো থেকে সহস্র মাইল দূরে সরিয়ে রেখেছে ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমার কণ্ঠ হয় বাকরুদ্ধ। সীমাহীন মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় থাকি।

এরই মধ্যে আমার প্রিয় বান্ধবীর বাসায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ুয়া জিয়া নামে একটি সুবোধ-সরল ছেলের সঙ্গে পরিচয়। আমাকে আন্টি বলে ডাকে। সময় পেলেই দেখা করতে আসে আমার বাসায় অবাধে। তাকে আপন ভাগ্নের মতোই স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা দিই। আমার কথাবার্তায় মৃত্যুর গন্ধ সে টের পেয়ে যায়। আমাকে অনুরোধ করে, আমার সমস্যা খুলে বলতে নিঃসংকোচে।

চরম অনিচ্ছায় যখন তাকে আমার শিশুকাল থেকে জীবনের কথা বললাম এবং অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর মায়া স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনলো তখন জিয়া হাউমাউ করে কেদে আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো। বললো, আন্টি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এমন নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমার মতো ভালো এবং সুন্দর রুচির মানুষ এ সমাজে বড় প্রয়োজন।

ভাগ্নের বাধভাঙা কান্না আমার পাষাণ মনকেও কাদালো।

সারা দিন থেকে আমাকে বেচে থাকার প্রতিজ্ঞা করিয়ে সে হলে ফিরলো। বিকেলে আমার সময় কাটানোর জন্য তার নিজের টিউশনিটা আমাকে দিল। ফোন করে, দেখা করে সব সময় আমার মন ভালো রাখতে ব্যস্ত। আমার চেয়ে প্রায় পাচ বছরের ছোট হবে। আমি তাকে নিজের ভাগ্নের মতোই স্নেহ-ভালোবাসা দিই অকৃপণভাবে। তার জন্য আমার বাসাটা আপনের মতো হয়ে যায়। অবাধ যাতায়াত, থাকা-খাওয়া।

মাথায় মৃত্যু চিন্তা ঢোকার পর থেকে আমি একা বাসা নিয়ে থাকি। মাঝে মধ্যে ছোট ভাইটা থাকে।

এক রাতে সেই স্নেহের ভাগ্নে আমার ওপর চড়াও হয় বন্য হিংস্রতা নিয়ে। আমার শত বাধা, বয়সের দোহাই, ধর্মীয় বিধান, নৈতিকতা অবশেষে করুণ আর্তি কোনো কিছুই সেই রাতে তার বন্যতাকে আটকাতে পারিনি। লজ্জায় জোরে চিৎকারও করতে পারিনি।

কিছুদিন পর শরীরে দ্বিতীয় সত্ত্বার অস্তিত্ব অনুভব করি। তাকে জানালে চিন্তা করতে নিষেধ করে এবং কিছু পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেয়। আমি তাই করি এবং মাতৃত্বের যন্ত্রণা ভোগ করি। প্রতিবেশীদের বলি জন্ডিস, তাই খেতে পারি না, বমি হয়।

আমি খুব ভালো মেয়ে বলে সুনাম এবং বিশ্বাসযোগ্য সবার কাছে। এরপর প্রায়ই জিয়া আসে এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করে। আমার চোখের পানি তাকে বিচলিত করে না। একদিন আমাকে হাতে–পায়ে ধরে মিনতি করে যেন ওটা ফেলে দিই। তা না হলে তার পড়ালেখা হবে না। সে মরে যাবে।

এতোদিনে না দেখা অস্তিত্বটার জন্য মায়াও লাগতে শুরু করেছে। আমি তাকে গোপনে বিয়ে করতে বলি। সমস্ত দায়িত্ব আমার, এমনকি তার লেখাপড়ারও। তার হলে গিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলি। হাত–পা ধরে মিনতি করি সজল চোখে। ঘটনা জানাজানি হলে আমার এবং আমার পরিবারের মানসম্মান ধুলোয় মিশে যাবে।

আমার মধ্যে পাপের অনুশোচনা আর সম্ভ্রমহানির লজ্জা টর্নেডো বইয়ে দিচ্ছিল। এর মধ্যে স্বপ্নে দেখি ফুটফুটে একটি ছেলে তার বাপের অবিকল চেহারার আমার কোল জুড়ে। আরো মায়া লাগে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিয়াকে ভালোবাসতে শুরু করি। তার প্রেমে পড়ে যাই। প্রথম প্রেম। তাকে জানাই। তার অনুভূতিও এ রকমই শোনালো। বিয়ের প্রসঙ্গে সময় চাইলো। কিন্তু সময় দিলে যে, লোক জানাজানি হয়ে যাবে। তাই ওকে অনুরোধ করলাম, আমি অনেক দূরে চলে যাবো। তুমি শুধু গোপনে স্বীকৃতিটুকু দাও। প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার এবং সন্তানের খোজ করো। আমি অপেক্ষায় থাকবো।

অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান তার পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি গুলশানে এক নামি ক্লিনিকে গিয়ে একাই ভ্রুণ হত্যার মতো আরো একটি জঘন্য পাপ করি। তিন দিন পর বাসায় আসি। তার হলে গিয়ে তাকে সব জানাই।

তার মুখের হাসি আমাকে আহত করে। বুঝতে পারি আমাকে এড়াতে চায়। মুখে যা আসে নোংরা কথা সবই বলে।

হজম করি সব তাকে এর মধ্যে প্রচণ্ড রকম ভালোবেসে ফেলেছি বলে।

নিরুপায় হয়ে তার সবচেয়ে ভালো বন্ধুটিকে ধর্মের ভাই ডেকে আমার সমস্যার কথা জানিয়ে সহযোগিতা চাইলাম। সেও আশ্বাস দিল আমাকে স্বীকৃতি আদায় করে দেয়ার।

মাহমুদকে একদিন আমার অফিসে জিয়াই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটির গ্রামের বাড়ি আমার জেলায়। তাকেও ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করি। আমার এ দুর্দিনে মাহমুদ সহানুভূতি দেখায়। একদিন বললো, চট্টগ্রাম যাচ্ছে তারা। আমি ইচ্ছা করলে যেন যাই। তাতে আমার মন ভালো হবে।

ভেবে দেখলাম মন্দ হয় না। ফুপাতো বোনের বাসায় বেড়াবো। মনটা ভালো হবে। নির্ধারিত দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে মাহমুদের হলে গেলাম। জহিরুল হক হল।

গিয়ে শুনলাম যাওয়া হচ্ছে না। মনটা সকাল থেকেই ভালো ছিল না। আমার এই সমস্যা কাউকে বলতে না পেরে ঘরে ছোট ভাইবোনদের ওপর ঝাঝ ফেলাই। তাই এক রকম রাগ করেই বের হয়েছিলাম। আমাকে জিয়ার বন্ধু মাহমুদ বলেছিল রাত এগারোটায় ট্রেন। তাই আমি সেভাবেই গিয়েছিলাম।

এতো রাতে বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করলো না। আত্মীয়স্বজনের বাসায় গেলেও আমাকে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সকলের প্রশ্ন এড়াতে সিদ্ধান্ত নিলাম রাতটা কোনো একটা হোটেলে কাটিয়ে সকালে ঘরে ফিরবো। মাহমুদকে জানালাম, সে যেন আমাকে মোটামুটি একটা ভালো হোটেলে পৌছে দিয়ে আসে।

চাকরির সুবাদে দেশের বাইরে গিয়ে হোটেলে থেকেছি। কিন্তু ঢাকার হোটেল সম্পর্কে একটু ভয়ও ছিল।

মাহমুদ বললো, চিন্তা করবেন না, আপনার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনে আমিও থেকে যাবো।

মাহমুদকে আমি ছোট ভাই ডেকেছি। এ যাবৎ সে তার আচরণ দিয়ে আমার সব রকম বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই ওর পীড়াপীড়িতে তাকে সঙ্গে রাখতে সম্মত হলাম।

বড় একটি ঘর ভাড়া নিলাম। দুটো খাট। বেয়ারা ঘর গোছানোর পর ক্লান্তি নিয়ে শুয়ে পড়লাম যার যার বিছানায়। দুর্ভাবনা আর অনিশ্চয়তা আমাকে গ্রাস করে আছে সারাক্ষণ। তাই ঘুমুতে পারলাম না। চুপচাপ শুয়ে জীবন চিন্তায় মশগুল। গভীরতা বাড়ছে রাতের। এক সময় অনুভব করলাম কার স্পর্শ। চোখ মেলে দেখি স্নেহের মাহমুদ আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে পরম মমতায়।

তাকে বাধা দিয়ে ঘুমুতে বললাম। কিছু সময় পর দেখলাম সে আমার স্নেহের বন্ধন ছিড়তে চাইছে, বিশ্বাস ভাঙার চেষ্টায় রত।

কেদে ফেললাম।

আমার সুন্দর সুশীল মনের সব ভালো উপদেশ দিলাম। নৈতিকতা, ধর্ম, বাস্তবতা সব। জিয়াকে মনে মনে স্বামী বলে স্বীকার করে নিয়েছি, তাও জানালাম।

তারপরও সে আমার সঙ্গে ব্যর্থ ধস্তাধস্তি করলো। লজ্জায় ফ্যানে শাড়ি পেচিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলাম।

মাহমুদ কাদলো, ক্ষমা চাইলো।

ক্ষমা করে দিলাম। সকালে তার গালে সমস্ত জোর দিয়ে কয়েকটা চড় মেরে তাকে ইউনিভার্সিটি এলাকায় ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরলাম।

তাকে আর জিয়াকে চিঠি লিখে পোস্ট করে আত্মহত্যার নতুন পথ বের করে সোজা সদরঘাট। মরতে পারলাম না। আহত হলাম। হাসপাতাল, বাসা। সুস্থ হয়ে দেখা করতে গিয়েছি মাহমুদের সঙ্গে। কিন্তু দেখা করেনি। এদিকে জিয়াকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। তাকে ভুলতে পারি না। তার হলে গেলে আমার সঙ্গে অত্যন্ত নোংরা কথা বলে, আচরণ করে জানোয়ারের মতো। ইচ্ছা করে তাকে খুব মারি। পারি না দুটো কারণে। প্রথমত. ভীষণ মায়া লাগে। দ্বিতীয়ত. দেখে ফেললে প্রকৃত ঘটনা সকলে জেনে যাবে।

আমার পরিবারের কেউ এখনো পর্যন্ত জানে না। ইচ্ছা করে ছোট ভাইদের বলি এবং তাকে বাধ্য করি বিয়েতে। কিন্তু সম্মান হারানোর ভয়ে চুপ থাকি। জিয়াকে বার বার অনুরোধ করি যেন শুধু গোপনে আমাকে স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কোনোদিন অধিকার আদায় করতে যাবো না। শুধু পাপ বোধ থেকে যেন আমাকে দয়া করে রেহাই দেয়। তার পাথর মন গলে না।

৩১ ডিসেম্বর ২০০৩। গিয়েছিলাম তাকে আবারও অনুরোধ করতে। সব ভুলে তার বন্ধু হয়ে থাকতে চাই। সে যেন আমার মনের শান্তিটুকু দেয়। কিন্তু আবারও নোংরা আচরণ হজম করে ফিরে আসি। নির্ঘুম রাত কাটাই চোখের পানিতে ভেসে। বার বার মরতে চাই। তবে কি এক অভিশাপে ব্যর্থ হই।

জিয়া আমার প্রথম প্রেম। তাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। আমি এখন কি করবো, কোথায় যাবো কিছুই ভেবে পাই না। সত্যিকার ভালোবাসা এভাবে গুমরে মরছে আমার বুকে দগদগে ঘা হয়ে।

জিয়া-মাহমুদ দুবন্ধুই সেবামূলক কার্যক্রম চালায় পড়ালেখার পাশাপাশি। কিন্তু আমার সঙ্গে তারা এমন করলো কেন? তাদের মতো সুন্দর সম্ভাবনাময় মেধাবী ছেলেগুলো যদি এভাবে নিজের নৈতিকতা বিসর্জন দেয়, অন্যের জীবন দুর্বিষহ করে তাহলে এ সভ্যতা এগিয়ে নেবে কারা? আমি কি একজন সত্যিকার বন্ধু, একটু স্নেহের পরশ, নির্ভেজাল ভালোবাসা কোথাও পাবো না? কি করে, কি নিয়ে বেচে থাকবো এই ভয়াবহ পৃথিবীতে?

অসহায় একজন

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

তোমাকে চাই

ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ কে বা কারা আমার বাসায় এক গোছা ফুল পাঠালো। এটা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো বোনদের মাঝে, সেই সঙ্গে ভাবলাম বন্ধুরা কেউ এ কাজ করতে পারে মজা করার জন্য।

বন্ধুরা বললো, তারা কেউ জানে না। সেই সঙ্গে তারাও অংশ নিল জল্পনা-কল্পনাতে।

এর মাঝে এক সুকণ্ঠি সেক্সি ভয়েস ফোনে উৎপাত শুরু করলো।

আমিও কথা চালিয়ে যেতে থাকলাম কে এই ফুলদাতা জানার জন্য। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিলাম ফুল বিক্রেতার ঠিকানায়। কারণ, তারাই রহস্যময়ী নারীর পক্ষে ফুল পাঠিয়েছিল। জানলাম দুই তরুণী তাদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে। কিছুদিন পর রহস্য উদঘাটিত হলো যে, বন্ধুর প্রেমিকা, বন্ধুর কাজিন আর তার বন্ধুর এই কাজ আমাকে বোকা বানানোর জন্য। আমি হলাম জব্দ।

এরই সুবাদে বন্ধুর অপূর্ব সুন্দরী কাজিনের সঙ্গে চলতে থাকলো ক্রমাগত দীর্ঘ ফোন আলাপ। ফলে শিগগিরই দুটি হৃদয় কাছাকাছি হলো। তবে আমি বার বার বলতে থাকলাম, তুমি ভুল চয়েস করছো।

আমাকে পাগলের মতো সে ভালোবাসতে লাগলো। এখনো আমাকে ভালোবাসে। মাঝে মধ্যে দেখা হতে লাগলো। ঘুরলাম বোটানিকাল গার্ডেন এবং শেষবার গেলাম চায়নিজে। সেখানে আমরা খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম। আমার হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম তার ঠোঁট, গাল আর হাতে হাত রাখলাম। আমরা দুজনই কামনার আগুনে পুড়তে থাকলাম। সারা শরীরে রক্ত প্রবাহ বেড়ে গেল। এটাই ছিল আমার প্রথম নারীকে স্পর্শ।

এর কিছুদিন পর তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। আমার পরিবারকে জানালাম আমার পছন্দের কথা। কিন্তু কেউই আমল দিল না। অনেকটা অসহায়ের মতো আমার দুর্ভাগ্যকে মেনে নিলাম। অপরাধী আমি জীবনের সেরা শাস্তি পেলাম। তার বিয়ে হয়ে গেল।

মাঝে মধ্যে গোপনে আমাদের বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হতো। শেষবারে আমার স্বপ্নের রানীর সঙ্গে দেখা হলো শাড়ি পরা অবস্থায়। আমার হার্টের বিট বেড়ে গেল হাজারগুণ। আমার ভাগ্যকে দোষ দেয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না।

আমি বিয়ে করলাম।

প্রথম ধাক্কা খেলাম স্ত্রীকে স্পর্শ করার পর। মন বার বার ফিরে যেতে লাগলো জীবনের প্রথম স্পর্শে। First love is the deepest. মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় মরা মানুষের স্পর্শে জেগে উঠি। যখন স্ত্রীকে ভালোবাসার চেষ্টা করি তখনই মনে হয় যাকে হারিয়েছি তাকে বোধ হয় ভালোবাসছি। কিন্তু সেই হৃদয় জোড়া আলোড়ন, বুকের শিহরণ। স্পর্শের উন্মাদনা পাই না।

আমার স্ত্রী হয়তো ভাবে, তাকেই বোধহয় ভালোবাসছি। আমি ভালোবাসি আরেকজনকে। সুনীলের ভাষায় বলতে হয়, যে ভালোবাসা দেরিতে বোঝা যায় তা নাকি সহজে ফেরত পাওয়া যায় না। এখনো আমাদের যোগাযোগ আছে গভীর গোপনে।

ভালোবাসা দিবসে তার প্রতি আমার প্রার্থনা, আমাকে ফিরিয়ে দিও না। একজন ব্যর্থ মানুষ তোমার করুণা ভিক্ষা চাচ্ছে। সারা পৃথিবী কি ভাবলো আমি জানি না। আমি শুধু তোমাকেই জানি। আমার প্রতিটি লোমকুপ, রক্ত কণিকা তোমাকে পাবার প্রতীক্ষায় আছে, থাকবো। Death is better than waiting. প্রথমত তোমাকে চাই... জীবনের শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই। যা হারিয়েছি তাকে হারাতে চাই না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দাগ

– মনজুর কায়ছার চৌধুরী

মর্জিনা একটি চিরকুট দেয় স্কুলের আয়া মালতির মায়ের মাধ্যমে। মর্জিনা আমার প্রাণপ্রিয় পছন্দের একমাত্র প্রেমিকা যাকে পাওয়ার আশায় দীর্ঘ একটি বছর অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়েছিলাম।

মনের মাধুরী মেশানো ভাষা দিয়ে ওই চিঠির উত্তর পাঠালাম। দুই দিন পর আরো একটি। শুরু হলো চিঠির লেনদেন। চলে প্রেম গভীর থেকে আরো গভীরে।

মর্জিনা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো আমাকে নিয়েই ঘর বাধবে। আমাকে ছাড়া বাচবে না, মরে যাবে। মরে গেলে পচবে না। তাও শুধু আমার জন্য ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রেমের স্রোতধারা বয়ে যেতে থাকলো।

একদিন সন্ধ্যায় মর্জিনার ক্লাসমেট এবং তার প্রেম প্রত্যাশী আরেক যুবক দুজন সহযোগী ক্যাডার নিয়ে অন্ধকার পুকুর পাড়ে ওৎ পেতে থাকে। আমি বাড়িতে ঢোকার সময় অন্ধকার থেকে বের হয়ে হঠাৎ তারা আমার গতি রোধ করে উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যায়।

তারপর বাইশ দিন চট্টগ্রাম মেডিকাল কলেজ হসপিটালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেচেছি কোনো রকমে। কিন্তু ডান হাতটি অকেজো হয়ে যায়। তবুও মেডিকাল কর্তৃপক্ষ ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। অনেক চেষ্টা করলাম আবার অপারেশন করাতে, ডাক্তাররা রাজি হয়নি। হাতে অসহনীয় ব্যথা রয়েই গেল।

অতঃপর একজন অর্থোপিডিক সার্জনের পরামর্শে রেফার করা হলো ইনডিয়ার তামিল নাড়ু প্রদেশের ভেল্লোর কৃশ্চিয়ান হসপিটালে। চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন ডাক্তার এন্ডারসন। প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় নিয়ে আমার আঘাত প্রাপ্ত স্থানগুলো তিনি দেখলেন। এবং আগের চিকিৎসার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। আমার বর্ণনা এবং প্রেসকৃপশন দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি জানালেন, চট্টগ্রাম মেডিকাল কলেজ হসপিটালে আমার ভুল চিকিৎসা করা হয়েছিল।

দুই দিন পর আবার অপারেশন। দীর্ঘ পাচ ঘণ্টা সময় নিয়ে অপারেশন হলো। কি উন্নত সেবা, অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, নার্সের ভদ্র ব্যবহার, ডাক্তারের আন্তরিকতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ড, পেশেন্টের প্রতি মেডিকাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বোধ দেখে আশ্চর্য হলাম। তারা আমাদের প্রতিবেশী দেশ। অথচ আমাদের স্বাস্থ্য খাতের কতো অব্যবস্থাপনা যেন একটি আয়নার এপিঠ-ওপিঠ।

অপারেশনের দিন রাত বারোটায় ডাক্তার আবার এলেন। হাতে একটি কাচের ছোট বোতল। বোতলটি দেখিয়ে বললেন, *দেখুন, আপনার হাতের ভেতর থেকে এই আট ইঞ্চি লম্বা সূতাটি বের করা হয়েছে। আপনার আগের অপারেশন সার্জনের গলায় এটি পরিয়ে দেবেন। ডাক্তারি পেশা ছেড়ে গরু চড়াতে বলবেন।*

খুবই লজ্জা পেলাম। আমার জন্মভূমি সোনার বাংলার ডাক্তারকে হেয় করায় দুঃখিত হলাম আমার দেশের ডাক্তারদের ওপর।

একদিন ডাক্তার এন্ডারসন বললেন, আপনার যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার হাতে আর্টিফিশিয়াল বোন রিপ্লেইসমেন্ট করতে হবে। না হলে এই হাত আপনার আয়ু কমিয়ে দেবে। কিছুটা ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও আমি প্রপার ট্রিটমেন্টের জন্য আর্টিফিশিয়াল বোন রিপ্লেইস করতে রাজি হলাম।

ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, রিপ্লেইসমেন্টের কাজটা একমাত্র লন্ডনে করালেই হানড্রেড পার্সেন্ট প্রতিকার পাওয়া যাবে যেহেতু এটি ডান হাত।

কিন্তু লন্ডনে যাবার মতো কোনো পথ খুজে পেলাম না। বুঝতে পারলাম দুঃখ আমার ভাগ্যে চিরস্থায়ী বাসা বেধেছে। এতো সবের মাঝে হসপিটালের বেডে শুয়ে শুয়ে বাম হাতে মর্জিনার কাছে প্রতি রাতে একটি করে চিঠি লিখেছি। দেহে ব্যথা সত্ত্বেও হৃদয়ে মর্জিনার কাল্পনিক ভালোবাসা অনুভব করে সুখ খুজে নিতাম।

দুই মাসে পঞ্চান্নটি চিঠি জমা হয়েছে। দেশে এসে সব চিঠি এক সঙ্গে দিয়েছি।

এক মুহূর্তের জন্যও প্রিয়দর্শিনী মর্জিনাকে ভুলে থাকতে পারিনি। মানুষ যে মুহূর্তে মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে তখন আমি শুধু মর্জিনার নামটিই জপ করতাম। মনে হতো কতোগুণ অনন্ত মধুময় সুধা মিশে আছে এই নামে।

দেশে আসার দুই মাস পর একটি চিঠি পেলাম তার। তাতে প্রথমেই লিখেছে, *এই আমি, সেই আমি, নেই আমি আগের মতো, ভুলে যাও আমায় নিয়ে, বুনেছো স্বপ্নের জাল যতো।*

মন থেকে মুছে যেতে যেতে স্মৃতি থেকে ঠিকই মুছে যাবে। হয়তো তখন কষ্ট পাবে না আর এভাবে।

বাকি চিঠি পড়ার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। মনে হলো, পৃথিবীর সব কিছু যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল আমার কাছে। চোখে অন্ধকার নেমে এলো। সাজানো সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেল। হিসাবের খাতায় ফলাফলে দেখলাম মর্জিনাকে ভালোবেসে উপহার পেলাম একটি পঙ্গু হাত এবং হলাম উদ্দেশ্যবিহীন জীবন্ত লাশ।

এদিকে হাতের তীব্র ব্যথায় আবার গেলাম তামিল নাড়ুর ভেল্লোর-এ।

ডাক্তার এন্ডারসন আমাকে দেখে অবাক! কিন্তু তিনি আমাকে লন্ডনের বিকল্প চিকিৎসা নেই বলে জানালেন।

আমি সীমাবদ্ধতার কথা জানালাম। এতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না।

ব্যর্থ মনে চলে গেলাম আগ্রার তাজমহলে শুধু কিছুটা শান্তি ও সান্ত্বনা খুজে পাওয়ার আশায়। যমুনার দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত সম্রাট শাহজাহানের গড়া অবিনশ্বর শ্বেতপাথরের তাজমহল দেখে মোহিত হলাম। একজন পুরুষের হৃদয়ে কতোটুকু ভালোবাসা থাকলে তাজমহলের মতো প্রাসাদ গড়া যায় তা শুধু তাজমহল দেখে বোঝা যায়।

ভাবলাম, প্রেয়সীর প্রেমে সিক্ত হয়ে প্রতিদানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে শাহজাহানারা মমতাজের জন্য তাজমহল গড়ে ভুবন বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু কোনো মমতাজ কি প্রেমের প্রতিদান পেয়ে শাহজাহানের জন্য *শাহমহল* গড়েছেন কি? পৃথিবীর সব মেয়েরা বোধহয় এমন শুধুই পেতে চায়, চায় না দিতে। সেটা মমতাজ হোক আর মর্জিনা হোক।

শাহজাহান ও মমতাজের ওপর সমাধির মাঝখানে দাড়িয়ে শুধু এটাই বললাম, শাহজাহান তোমার হৃদয়ে মমতাজের জন্য যতোটুকু প্রেম ছিল ততোটুকু প্রেম মর্জিনার জন্যও আমার হৃদয়ে ছিল। ব্যবধান শুধু এতোটুকু, তুমি প্রেমের প্রতিদান পেয়ে তাজমহল গড়েছো আর আমি প্রতারিত হয়েছি।

শারীরিক কষ্ট নিয়ে দেশে এলাম। চেষ্টা করতে থাকলাম লন্ডনে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না।

এরই মধ্যে হঠাৎ এক দুপুরে পানিতে ডুবে ছোটভাই মারা যায়। পরিবারে নেমে আসে বেদনার কালো মেঘ। রক্তের ভাইকে হারিয়ে পাগল প্রায় মা-বাবা তো জীবন্মৃত।

এর সপ্তাহ খানেক পর মর্জিনার বিয়ে হয়ে যায়। আমাকে একটিবার জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের কবর রচিত হলো। পৃথিবীটা আমার কাছে এই যৌবনেই পানসে হয়ে গেল।

শারীরিক, আর্থিক, মানসিক সব দিকে বিপর্যস্ত হলাম শুধু মর্জিনাকে ভালোবেসে। মর্জিনা এখন অন্যের গৃহে আদর্শ বধূ। আর আমি? আমি প্রতারণার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে দিন কাটাই।

নাজিরহাট, চট্টগ্রাম থেকে

যার যেথা জীবন

– নাসরিন চৌধুরী

ওরা গে (Gay) স্বামী–স্ত্রী। দুজন পুরুষ। বয়স ছাব্বিশ আর আটাশ। দুই সপ্তাহের জন্য স্বামী জন (২৮) ব্যবসার কাজে এসেছিল নিউ ইয়র্ক। ফিরে যাবার একদিন আগে স্ত্রী কবি স্মিথ (২৬) নিজেদের বাসস্থান মিনিসোটা থেকে আসে নিউ ইয়র্ক। কৃসমাসের আনন্দ অনুষ্ঠানের উদযাপনের জন্য এখন ঘরে ঘরে বাজারের ধুম। দোকানগুলোতে হরেক রকম আধুনিক ডিজাইনের পোশাক। বাচ্চাদের মনোহারী খেলনার স্তূপ দোকানে দোকানে। কবি স্মিথ–এর নিউ ইয়র্কে আসার প্রধান কারণ, বন্ধু, স্বামী জনকে চমকে দেয়া এবং শপিং করা। ডিসেম্বর থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক থাকে সরগরম।

নিউ ইয়র্কের দেহে প্রাণের বন্যা বয়ে যায় শত ধারায়। প্রতিটি বাড়িতে থাকে আলোকসজ্জা যারা মুসলিম তারা অবশ্য বিষয়টি এড়িয়ে চলে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বাড়িতে আলোকসজ্জা করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। সারা আমেরিকাতেই তখন রাতের বেলা আলোর ফুল ফোটে। সান্টা ক্লজও দেখা যায় আলো মুকুট পরে শাদা চুল দাড়িতে দরজাতে দণ্ডায়মান।

প্রায় ছয়দিন বন্ধুর অদর্শনে স্মিথ বিষণ্ন হয়ে যায়। তাই হঠাৎ চলে আসে জন্মস্থান নিউ ইয়র্কে। ম্যানহাটানের কোনো এক হাসপাতালে জন্ম। এ শহরেই লেখাপড়া। হাই স্কুল শেষ করার পর কলেজে সে ক্লাসমেট হিসেবে জনকে পায়। জন–এর গভীর কালো চোখ কবি–কে মুগ্ধ করে। সারাক্ষণ তারা এক সঙ্গে সময় কাটায়। লাইব্রেরি, ক্লাস, সুইমিং পুল, থিয়েটারে সব জায়গায় দুজনে এক সঙ্গে।

বন্ধুকে বন্ধু ভালোবাসবে এ তো জানা কথাই। পৃথিবী জোড়ায় প্রচলিত আছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালোবাসার কথা। বন্ধু বিহীন মানুষ কমই আছে। একাকী নিভৃতে যারা থাকতে চায় তাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে না। তাদের সঙ্গে কারো বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধু–বান্ধব যাদের নেই তারা আক্ষেপও করে না। তাদের সেই বোধটাই নেই। বন্ধুত্ব হচ্ছে তৃষ্ণার্ত খর দুপুরে এক গ্লাস লেবুর কোমল শরবতের মতোই উপাদেয়।

এ দেশে হাল আমলে বন্ধুত্ব অটুট রাখার জন্য গে হয়ে যেতে বন্ধু দ্বিধা করে না। যারা গে তাদের চালচলন আচরণে কিছুটা মেয়েলি ভাব থাকে। সহজেই তাদের শনাক্ত করা যায়। পুরুষে পুরুষে বিয়েটা আমেরিকায় এখন আইন সিদ্ধ। সমাজ প্রবল বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত আইনটির প্রচলন হয়। আমেরিকায় মানুষের আর অপূর্ণতার কিছুই রইলো না। ডিসেম্বর মাসে *রকফেলার সেন্টার*–এ কৃসমাসের টৃ দেখার জন্য মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতোই। ফিফথ এভিনিউতে সবচেয়ে বড় কৃসমাস টৃ স্থাপন করা হয় প্রতি বছর। যিশু খৃস্টের জন্ম কি এই গাছের নিচে হয়েছিল? কেন এই গাছের এতো মর্যাদা আর আকর্ষণ? ঘরে ঘরে এই গাছ সাজানো হয়। রঙিন মোড়কে সাজানো খেলনা রাখা হয় গাছের নিচে। ঘুম থেকে জেগে শিশুরা আবিষ্কার করে তাদের জন্য রক্ষিত কতো উপহার সামগ্রী।

আমার একা একা পথ চলতে মাঝে মধ্যে বেশ লাগে। কিছু কেনাকাটা ছিল। পাতাল ট্রেনের পেট থেকে বেরিয়ে উপর উঠছি, রকফেলার সেন্টারে পাতাল ট্রেনেই যেতে হয়। পাতালেও দোকানপাট। ফুলের দোকানের পাশ দিয়ে উপরে যাবো। অজস্র তাজা ফুল, সবুজ গাছ।

ডিসেম্বরে নিউ ইয়র্কে ফুল ফোটে না। গাছে পাতা থাকে না। অথচ ফুলের দোকানগুলোতে তাকালে অবাক হতে হয়। কোথায় ফোটে এতো ফুল, কোন বাগানে! আসলে ফুল আসে উষ্ণ এলাকা থেকে অর্থাৎ অন্য স্টেট থেকে। অথবা পলিথিনের ছাউনি দেয়া অনেক ফার্ম আছে যেখানে বারো মাস ফুল ফোটানো হয়। যারা ফুলের ব্যবসা করেন তাদের আবহাওয়ার জন্য কখনো চিন্তিত হতে হয় না। ফুল তো ফুটছেই। ডেলিভারি হচ্ছে। ফুলপ্রেমী মানুষেরা ফুল কিনছেই।

আমার চোখ থমকে গেল। এ দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় বহুবার দেখিছি। কিন্তু বাস্তবে সামনাসামনি এই প্রথম দেখা। দুজন পুরুষ। লম্বায় ছয় ফিটের কাছাকাছি। দুজন দুজনের কোমর জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে চুমু খাচ্ছে, জিভ চাটছে।

হ্যাংলার মতো এসব দৃশ্য দেখার মানুষ নই আমি। শুধু মনে মনে ভাবছি, তারা কতো অনায়াসে সব করে ফেলে। ভালোবাসার মানুষকে আদর করার জন্য তারা আড়াল খোজে না। কিন্তু পৃথিবীতে কি মেয়ের সংখ্যা কমে যাচ্ছে নাকি? ছেলেতে ছেলেতে বিয়ে করতে হবে, সংসার করতে হবে! নাকি মেয়েদের প্রতি তাদের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে? আবার যখন লেসবিয়ান মেয়েরা বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখনো একই প্রশ্ন জাগে, পুরুষের প্রতি মেয়েরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে কেন?

আমার এই মুহূর্তে ফুল কেনার ইচ্ছে ছিল না। হঠাৎ করে বহুদিনের পুরনো কলিগ কোড়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি একটা এইডস প্রজক্টে বছর তিনেক কাজ করেছিলাম। অফিস ছিল জ্যাকসন হাইটস-এ। *বেটি এপিচা* হিসেবেই পরিচিত। সাউথ এশিয়ান নারী পুরুষদের এইডস রোগ থেকে দূরে থাকা এবং যারা এইডস-এ আক্রান্ত হয়ে গেছে তাদের সহায়তা দান করে এপিচা। বেশির ভাগ চায়নিজ ছেলেমেয়েরা এপিচা-তে ফুলটাইম, পার্টটাইম চাকরি করে। এপিচা-র মতো আরো কতো ধরনের এনজিও আমাদের আশপাশে আছে। শুধু চায়নিজ নয় - জাপানিজ, ফিলিপিনো, কোরিয়ান, ইনডিয়ান, পাকিস্তানি, বাংলাদেশিরা অনেকেই এপিচার কাজ করছে। এখন ম্যানহাটানে অফিস।

কোড়া ফিলিপিনো মহিলা। আমার সহকর্মী। এখন আর আমরা দুজনই এপিচার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই। ভীষণ উদ্যমী মহিলা। প্রচণ্ড ছুটতে পারে। বহুদিন পর কোড়া-র সঙ্গে দর্শন হওয়ার কারণে এক গোছা ফুল কিনে তার হাতে দিই। কোড়া তখন আমাকে সহাস্যে গে দম্পতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, কোড়ার বান্ধবীর ছোট ভাই হচ্ছে কবি স্মিথ। আমি হাই বলি।

জন আমার দিকে হ্যান্ডশেক-এর হাত বাড়িয়ে দেয়, কবিও।

হাত গুটিয়ে রাখবো কি? তারা সমকামী। গে অচ্ছ্যুত, নরকের কীট, আমার হাত ছুয়ে দিলে আমি কি পাপী হবো? আমি তাদের প্রকাশ্যে ঘৃণা করছি তারা যখন বিষয়টি আচ করতে পারবে, আমিই তখন পাপী হবো। মানুষ হিসেবে মানুষের সৌজন্য দেখানোটা জরুরি। তাদের জীবন তাদের। আমার জীবন আমার।

কোড়া তখন অনর্গল বলে যাচ্ছে। আর বলো না, এমন প্রেমপাগল দুজন।

স্মিত হেসে বললাম, তাই তো দেখছি।

কোড়া আবার বলতে শুরু করে। আর মাত্র একদিন পরই জনের ফিরে যাবার কথা ছিল, কবি-র কাছে, অথচ কবি আমাকে ফোন করে বললো, আমি আসছি, তুমি একটা এপয়েন্টমেন্ট করো জনের সঙ্গে। রকফেলার সেন্টারের পাতাল ট্রেনে ফুলের দোকানের সামনে যেন তোমার সঙ্গে দেখা করে ঠিক সোয়া তিনটায়। সে সময় আমি থাকবো ফুলের দোকানের সামনে, কোড়া, তুমি আসবে একটু পর। সত্যি দুজন দুজনকে কাছে পেয়ে এমন উন্মাতাল হয়ে গেল।

জনের চোখের দিকে তাকাই। তার পিঙ্গল বাদামি চোখ, সোনালি চুল, শাদা চামড়া ছাপিয়ে দেখি একজন মানুষকে, একজন পুরুষকে যার সাধ জেগেছে বন্ধু কবিকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে। কবিরও ইচ্ছা হয়েছে জনকে বিয়ে করার।

তাদের বাবা-মা কি এই বিয়েতে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছিলেন? প্রশ্নটা ছুড়ে দিই কোড়ার দিকে।

ততোক্ষণে জন, কবি গে দম্পতি একে অপরের হাত ধরে পাতাল ছেড়ে উপরে চলে গেছে। তারা দুজন শপিং করবে, খাবে। স্কেটিং করবে কৃসমাস ট্-র পেছন দিকের বরফের পাটাতনে। তারা হ্যাপি নিউ ইয়ার উদযাপন করবে এই শহরে। বাবা-মায়ের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে। থাকবে হোটেলে।

কোড়া ম্লান হেসে বলে, না, বাবা-মা বাধা হয়ে দাড়াননি এই বিয়েতে। তবে তারা খুশিও হননি। পৃথিবীর সব বাবা মা-ই চান, তাদের সন্তান সুস্থ থাকুক, স্বাভাবিক থাকুক।

তোমাদের ফিলিপিনো প্রজন্ম যারা এ দেশে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কি লেসবিয়ান বা গে হয়ে যাচ্ছে?

কোড়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, হ্যা, কিছু কিছু। তারা আমাদের স্নেহ দৃষ্টি হারাচ্ছে।

আমার মনে পড়ে, এপিচা অফিসে চায়নিজ, কোরিয়ান, ফিলিপিনো উদ্ভট কিছু ছেলেমেয়ে ছিল, তারা ইয়াং প্রজেক্টের কাজ করতো। এইডসমুক্ত সমাজ গড়তে গিয়ে তারাই যে এর বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছিল তা তাদের পোশাক, চুল, ঠোঁট, জিভ, নাভিতে দুল দেখে অনুভব করেছিলাম। সবার ব্যাগেই তারা কনডম রাখে। আহা কতো সচেতন! জানি না, এ ধরনের তরুণ-তরুণী দিয়ে পৃথিবীর শোভা কতো গুণ বাড়ে বা কমে।

আমাদের জগৎখ্যাত তসলিমা নাসরিন বার বার বিয়ে করলে, পুরুষ বন্ধুর শয্যায় আবগাহন করলে, সমাজে থুথুর স্তূপ পড়ে যায়। তসলিমাকে অচ্ছ্যুত বলে অনেকেই আতকে ওঠে।

ক আর *দ্বিখণ্ডিত* একই বই। ক আমার পড়া হয়নি, দ্বিখণ্ডিত পড়েছি। মাত্র পনেরো থেকে বিশ পাতায় যৌন বিষয়ক কথাবার্তা, প্রেম, ভ্রমণ। বাকি তিনশ আশি পাতায় অনেক কথা, অনেক ব্যথা। আসলে তসলিমা নাসরিন ভুল দেশে জন্মেছিলেন। তসলিমার মতো মনমানসিকতার মানুষের সঠিক স্থান হলো পাশ্চাত্য, ইওরোপ, আমেরিকা। অনেক অসুখী-বিকৃত রুচির মানুষেরা দুনিয়াতে একটা উল্টা-পাল্টা কাজ করে আনন্দ পায়। তাদের আনন্দে কেউ ছাই ঢালতে আসে না, থুথু দিতে আসে না। তসলিমার বই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা সমাজ এই বেহায়াপনাকে ক্ষমা করে না। তসলিমাকে কেউ কেউ *পতিতা* বলে। তসলিমার যারা সঙ্গী হয় তাদের কেউ *পতিত* বলে না। কারণ, মেয়েরা পচে যায় - নষ্ট, ভ্রষ্ঠা, কুলটা হয়। পুরুষের জন্য, নষ্ট পুরুষের জন্য অভিধানে সে রকম মজবুত শব্দ নেই। তাদের বলা যায় বদমাইশ, গুণ্ডা, চরিত্রহীন। তবুও কোনো শব্দটিই পতিতার কাছাকাছি পৌছায় না।

আজকে পাশ্চাত্য সমাজে ছেলেতে ছেলেতে বিয়ে, মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে আইন সিদ্ধ। তাদের সমাজ তো ধ্বংস হয়ে যায়নি! তাহলে তসলিমা সত্য কথা বলতে গিয়ে বাঙালি সমাজকে কলংকিত করছে বলে যে রব উঠেছে, তা কি গ্রহণযোগ্য? তসলিমার জীবন যেভাবে ইচ্ছা ভোগ করবে, ধ্বংস করবে - করুক না!

নিউ ইয়র্ক থেকে
ncjashim@earthlink.net

চিকেন পক্স লাভ

- শাহরিয়ার

আমি তখন যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। পড়ালেখায় ভালো না হলেও প্রথম বিশজনের মধ্যে অবস্থান করতাম।

আমার একটা ফ্রেন্ড টিম ছিল। সংখ্যায় চারজন। আমি, ইমন, বাধন ও রনি। আমি যাকে পছন্দ করতাম মানে আমার ইয়ে তার নাম ছিল রুমি।

সবাই আমার নামের প্রথম অক্ষর এবং তার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে ডাকতো। আমার নাম হলো SR। Shariar-এর S এবং Rumi-র R। সবাই আমাকে এই নামে ক্ষেপাতো।

তখন আমাদের ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটা পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে।

সেদিন ছিল ধর্ম পরীক্ষা। সকালে বন্ধুদের বললাম, আজকে প্রস্তাব দিতে পারলে ফু-ওয়াংয়ে খাওয়াবো।

আমি এবং রুমি ভিন্ন ক্লাসে পড়তাম। রুমি পড়তো ক্লাস নাইনে। ভয় পাচ্ছিলাম সে আমাকে ফিরিয়ে দেবে। তবুও আজ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাকে আমার মনের কথা তাকে জানাবোই। যেভাবেই হোক।

রুমির পরীক্ষা বারোটায় শেষ। আগের দিন তাকে বলেছিলাম, সাড়ে বারোটায় ফু-ওয়াংয়ের সামনে দাড়াতে। তাই আগে চুল কাটালাম। গোসল করে স্কুল ড্রেস সুন্দর করে পরলাম। তারপর গেলাম নির্দিষ্ট স্থানে।

গিয়ে দেখলাম সে তখনো পরীক্ষা শেষ করে বের হয়নি।

আমরা একই ব্যাচে প্রাইভেট পড়তাম। আমাদের ব্যাচে আরো কয়েকটি ছেলে পড়তো। দেখলাম ওই ব্যাচের দুটি ছেলে এসে আমার পিছু নিয়েছে। তারা অবশ্য আগে থেকেই জানতো। কে বা কার মাধ্যমে যেন জেনেছে আজকে আমি প্রস্তাব দেবো।

স্কুলের ভেতরে গিয়ে দেখলাম রুমি দাড়িয়ে আছে। তাই আবার একই স্থানে গিয়ে দাড়ালাম।

কিছুক্ষণ পর সে এলো। দেখে বুঝলাম রেগে আছে। আমার তখন প্রাণ পাখি উড়ি উড়ি করছে। ফু-ওয়াংয়ের সামনে দুই চারজন দাড়িয়ে আছে। তখনো জানি না যে, তারা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে আগেই অন্যদের বলে দিয়েছে।

রুমি রেগে সব কিছু জানতে চাইলো।

আমি তোতলানো শুরু করলাম। আমার অবস্থা খারাপ। তখন সাইড থেকে ওই দুজন বলে দিল, সে তোমাকে ভালোবাসে।

আমার মুখের অবস্থা তখন লাল, নীল, বেগুনি। দেখলাম সে রেগে ফেপে-ফুলে আগুন।

কি করবো? বলতেও পারছি না যে, চলো একটু নাশতা করি।

রুমি বললো, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুমি এ কথা বলবে। ছিঃ, থুঃ থুঃ!

আশপাশের লোকজন তখন আমার দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে।

চোখে পানি এসে গেল। পানি আড়াল করার জন্য অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলাম। প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়ে ধর্ম পরীক্ষা দিতে গেলাম। তারপর বন্ধুদের নিয়ে ফু-ওয়াংয়ে খাওয়ালাম।

পরদিন ঘর থেকে বের হতে গিয়েই দেখলাম গায়ে ফোট মতো হয়ে ভেতরে পানির মতো কি যেন জমেছে। বাসায় এসে আম্মাকে দেখাতেই বললেন, তোর চিকেন পক্স হয়েছে।

পরদিনই সারা শরীরে ছেয়ে গেল।

বন্ধুরা নাম দিল *চিকেন পক্স লাভ।*

আরাপপুর, ঝিনাইদহ